এই বলিয়া হরিশ বাবু প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে বিবাহের প্রস্তাবটা পাকিয়া দাঁড়াইল। তারাপদবাবু সমুদায় বিবরণ লিখিয়া রায় মহাশয়কে পত্র লিখিলেন। সৌদামিনীও নয়ন-তারাকে সমুদয় বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ও নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার পরামর্শ জানিবার জন্য পত্র লিখিলেন। রায় মহাশয় ও নয়ন-তারা অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর স্থির করিলেন যে কিছুদিন বিলম্ব করা ভাল, দেখা যাক্ গোবিনের পরিবর্ত্তনটা পাকা কি না? তদনুসারে উভয়কে পত্র লেখা হইল।

এদিকে এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি একদিন নয়ন-তারা ডাকযোগে একখানি "কলিকাতা গেজেট," কতকগুলি বিলাতি মাসিক পত্রিকা ও দুইখানি বৈ পাইলেন। প্রেরকের নাম নাই। কিন্তু হস্তাক্ষর দেখিয়া বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে তাহা হরেন্দ্রের প্রেরিত। কলিকাতা গেজেটখানি খুলিয়া দেখেন, যে হরেন্দ্র ফেব্রুয়ারি মাসে যে বিজ্ঞানে এম্-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আনন্দের বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন,—"বাবা! হরেনবাবু ফাষ্ট্ ডিবিজনে এম্-এ পাস হয়েছেন।"

রায় মহাশয়। দেখি (গেজেটখানা লইয়া দেখিয়া) আমি জান্তাম ও পাস হবে, ও কি একটা সাধারণ ছেলে! (হরেন্দ্রের প্রেরিত মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখেছ, হরেন কেমন পরের জন্যে ভাবে, জানে আমরা একলা একলা এই নির্জ্জনে পড়ে আছি, এগুলো পেলে আমাদের একটা পড়বার জিনিস হবে, তাই সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে। তুমি আমার নাম করে তাকে পত্র লেখ, বল যে আমি সে পাস হওয়াতে ভারি সুখী হয়েছি। আরও লেখ যে টুনী পটলার ছুটীর সময় যে এখানে আসবার কথা হচ্ছে, তাদের জন্যে বোট যাবে, সেও যেন তাদের সঙ্গে আসে, এখানে দিন কতক থেকে তারপর বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে দেখা কর্তে যাবে।"

এই বন্দোবস্তে নয়ন-তারা বড়ই প্রীত হইলেন। সেই দিন আহারের পর বহু দিবসান্তে হরেন্দ্রকে পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই—"অনেক দিন পত্র লিখি নাই, মনে করেছিলাম আপনি পত্র না লিখলে আর লিখব

না। কিন্তু আপনার পাসের খপর পেয়ে এতই আনন্দ হয়েছে, যে আর পত্র না লিখে থাকতে পার্‌ছি না। রাগ উষ্মো যেন সব ধুয়ে গিয়েছে। বাবাও ভারি খুসী হয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যে টুনী পটলার জন্যে বোট যাবে, বাবা ভাবছিলেন দাদাকে তাদের নিয়ে আস্‌তে বল্‌বেন, কিন্তু আজ বলেছেন যে আপনি তাদের আন্‌বেন ও এখানে কয়েক দিন থেকে মার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবেন। আমার মনের মত কথাটা হওয়াতে ভারি আনন্দ হয়েছে; এখন আপনি বেঁকে না বস্‌লে হয়। স্থানটী বড় মনোরম, একবার আসুন, খুব ভাল লাগবে।"

চুঁচড়ার বাড়ীতেও এই মর্ম্মে পত্র আসিল। হরেন্দ্রের সঙ্গে বোটে পিতার কাছে যাবে শুনিয়া টুনী ও পটলা নাচিতে লাগিল।

যথাসময়ে বোট আসিল। একদিন প্রাতে সকাল সকাল আহার করিয়া হরেন্দ্র টুনী ও পটলাকে লইয়া বোটে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য এ বন্দোবস্তটা সুরেশের মনঃপূত হইল না। ছেলেরা খাইয়া, খেলাইয়া, গাইয়া, হরেন্দ্রের নিকট গল্প শুনিয়া, আনন্দে চলিল। হরেন্দ্র তাহাদের আনন্দটা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য রহিয়া বসিয়া চলিলেন।

তাঁহাদের সঙ্গে আর একজন আছে, তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে টাইগার। টুনী পটলা যদি চলিল, তবে টাইগার থাকে কার কাছে? আর টাইগারকে ফেলিয়া তারাইবা থাকে কিরূপে? সুতরাং টাইগারও চলিয়াছে। তবে সে বেচারার বন্ধন দশায় থাকা বড় কষ্টকর। একটু দৌড়িতে পারে না, ইঁদুর ছুঁচাটা তাড়া করিতে পারে না, কেবল বোটের পাপোষটীর উপরে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমান, অথবা বেঞ্চখানির উপরে উঠিয়া নদী দেখা, ইহা কতক্ষণ ভাল লাগে? কাজেই টাইগারের বড় কষ্ট! তবে সুখের মধ্যে নড়িতে চড়িতে টুনীর আলিঙ্গন ও চুম্বন পায়, ইহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে!

টুনীর গল্প শুনিয়া যেন পেট ভরে না! সেদিন সন্ধ্যার পর বোটের ছাতে চন্দ্রালোকে বিছানা হইল। সেখানে টুনী হা করিয়া হরেন্দ্রের ঘাড়ে পড়িয়া গল্প গিলিতে লাগিল। হরেন্দ্র এক রাজকুমার ও রাজকুমারীর গল্প করিলেন। তাহারা বনে ফুল তুলিতে গিয়াছিল; একটা

রাক্ষসী মায়ারূপ ধরিয়া আসিল; পথ ভুলাইয়া রাজকুমার ও রাজকুমারীকে রাক্ষস-পুরীতে লইয়া গেল; রাজকুমারকে একদিন কুটিয়া ঝোল ও অম্বল রাঁধিল; তাহা দেখিয়া রাজকুমারী রাত্রে পলাইল; আবার রাক্ষসী তাহাকে ধরিয়া আনিল—এই সকল শুনিতে শুনিতে টুনী ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিতে লাগিল, "দুষ্টু রাক্সুসী।" পটলা বলিল, "দুর্ এ যে গল্প।" আর শোনে কে, প্রায় পাঁচ মিনিট কাঁদিল। হরেন্দ্র বলিলেন, "তবে থাক্," টুনী আবার জেদ করিয়া ধরিল, "আপনার দুটী পায়ে পড়ি, বলুন আমি আর কাঁদ্‌বো না।" বোটের সময়টা এইরূপে কাটিতে লাগিল।

ক্রমে একদিন অপরাহ্ণে বোট গুপ্তিপাড়ার চড়াতে লাগিল। হরেন্দ্র দেখিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ নয়ন-তারা ঘাটের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। টুনী ও পটলা নৌকা হইতে নামিয়াই দিদিকে জড়াইয়া ধরিল ও কত আদর করিল। তৎপরে পিতার উদ্দেশে বাঙ্গলার দিকে ছুটিল। হরেন্দ্র ও নয়ন-তারা কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে চলিলেন।

নয়ন-তারা। (হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) তবু ভাল, আপনি এলেন, আমি ত মনে করেছিলাম এ জন্মে আর আপনার সঙ্গে কথা কবো না।

বহু দিনের পর সেই হাসি হাসি মুখখানি দেখিয়া হরেন্দ্রের মন সুধা-রসে সিক্ত হইয়া গেল; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন নয়ন-তারার মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সাধুতার আভাতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রোগীর শুশ্রূষাতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কৃশ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) অভিমান বুঝি কেবল আপনিই করতে জানেন? কথা না কইলে আমি কথা কবো কেন?

নয়ন-তারা। বাপ্‌রে বাপ কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! মেয়ে মানুষ একদিন অভিমান করে থাক্‌তে পারে, পুরুষের কি এত টং হয়ে থাকা ভাল?

হরেন্দ্র। আচ্ছা, একি ব্যবহার! আপনি এলেন, আস্‌বার সময় একবার বলেও এলেন না।

নয়ন-তারা। আপনিও ত কিছু বল্লেন না। যাহোক, এসেছেন বেঁচেছি, আপনাকে দেখবার জন্যে হা করে পথ চেয়ে ছিলাম। (হাসিয়া) আপনি

শেলির "মেঘের" ন্যায় বলিতে পারেন—I bring fresh shower for the thirsting flower—"এনেছি বরষা-ধারা পিয়াসু কুসুম তরে।"

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) ওটা উভয়ত।

নয়ন-তারা। যাহোক্ যখন এসেছেন, তখন আর শীঘ্র ছাড়ছি না।

হরেন্দ্র। মাকে অনেক দিন দেখিনি, একবার গিয়ে তাঁর চরণ দর্শন কর্‌তে হবে ও কিছু দিন তাঁর কোলে থাক্‌তে হবে।

নয়ন-তারা। সেটা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু বাবা যে দুচার দিনের মধ্যে ছাড়েন এমন মনে হয় না।

হরেন্দ্র। হাঁ তাইত তাঁর কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিছি, তিনি কেমন আছেন ?

নয়ন-তারা। এখানে এসে প্রথম প্রথম ভালই ছিলেন, আবার কিছু দিন হতে শরীরটা খারাপ হচ্ছে। বোধ হয় কিছু দিন পরে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

হরেন্দ্র। জায়গাটা বেশ।

নয়ন-তারা। দেখছেন কেমন সুন্দর স্থান! এর কাছে একটা বড় বিলের মত আছে; সেখানে বোটানির অনেক স্পেসিমেন পাওয়া যায়। আমি একদিন গিয়ে কতকগুলো এনেছিলাম।

হরেন্দ্র। বটে, সেটা আমাকে দেখতে হবে। আপনি খুব বোটানি পড়ছেন, না ?

নয়ন-তারা। হাঁ এক আধটু পড়ছি বৈকি ? অনেক দিনের পরে আপনাকে দেখ্‌লাম নূতন খবর কিছু আছে কি না ?

হরেন্দ্র। নূতন খবরের মধ্যে এম্-এ পাস করে আমার প্রোমোশন হয়েছে; ও মাহিনা বেড়েছে।

নয়ন-তারা। বাঃ এ কথাত কেউ আমাকে লেখে নি। কত মাহিনা হয়েছে।

হরেন্দ্র। ৭৫৲ টাকা।

নয়ন-তারা। বাবা শুন্‌লে খুব খুশী হবেন। তাঁকে বল্‌ছি।

হরেন্দ্র। না না থাক্, তাঁকে তাড়াতাড়ি বলবার দরকার কি ?

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে গিয়া রায় মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত। দেখিলেন রায় মহাশয় তনয় তনয়াকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া তাহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছেন। টাইগার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎসুক অন্তরে প্রতীক্ষা করিতেছে; যেন আদরের কিছু অংশ সে চায়। টাইগারের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে রায় মহাশয় বলিলেন, "কি রে টাইগার তুইও আমাকে দেখ্‌তে এসেছিস্? বেশ।" টাইগার লাঙ্গুল নাড়িয়া মনের আনন্দ জানাইল।

হরেন্দ্র রায় মহাশয়ের চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইলেন।

নয়ন-তারা। বাবা এম্-এ পাস করে ওঁর মাইনে বেড়ে ৭৫৲ টাকা হয়েছে।

রায় মহাশয় শুনিয়া অতিশয় আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎপরে নয়ন-তারা হরেন্দ্রকে আপনার গৃহস্থালির সমুদায় বন্দোবস্ত দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। টুনী ও পটলা পিতার আলিঙ্গন পাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে বাড়ীখানির কোথায় কি আছে, সমুদয় দেখিয়া ফেলিল; শেষে প্রান্তরে দৌড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নয়ন-তারা তাহাদিগকে কিছু আহার করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের সে দিকে দৃষ্টি নাই; তাহারা কোনও মতে নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া, চড়ার পাশে লোকে মাছ ধরিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য ছুটিল। গাভী দুটীর জন্য একটী বালক ভৃত্য আছে, নয়ন-তারা তাহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন, সেও সঙ্গে ছুটিল।

টাইগারও বাড়ীখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছাড়ে নাই। সে গাভীদ্বয়ের গোয়ালে গিয়াছিল, সেখানে গাভীদ্বয় তাহাকে গুঁতাইতে আসিয়াছে, সে ডাকাডাকি করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে। তৎপরে সেও মনের সাধে ছেলেদের সঙ্গে দৌড়িতেছে।

এ দিকে নয়ন-তারা হরেন্দ্রকে কিছু আহার করিতে দিয়া, চুঁচড়া হইতে আনীত জিনিস পত্রগুলি দেখিতে ও যথাস্থানে রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুটুলিগুলি খুলিতে গিয়া অপরাপর জিনিসের মধ্যে একটী কাগজের বাক্স পাওয়া গেল, খুলিয়া দেখেন তন্মধ্যে টুনীর খেলিবার পুতুল। দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন;—"আর কিছু আনুক না আনুক, পুতুলগুলো এনেছে।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) বল্‌লে কি হয়, ছেলে ফেলে কি মা কোথাও যেতে পারে?

নয়ন-তারা। সত্যি! পনর বছরের মেয়েটা হতে গেল আজও পুতুল খেলা গেল না।

হরেন্দ্র। আপনারাও বোধ হয় পনর ষোল বছর পর্য্যন্ত পুতুল খেলেছেন, এখন মনে নাই।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) তা খেলেছি বৈ কি?

হরেন্দ্র। টুনীকে আমার বড় মিষ্টি লাগে।

নয়ন-তারা। ওরা এসে বেঁচেছি, দেখ্‌লেন না, ওদের দেখেই বাবার মুখটা কেমন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তার পর, ওরা বাবার কাছে থাক্‌লে আমি পড়বার শোনবার, চিন্তা কর্‌বার অনেকটা সময় পাব। আপনি কি ভাল বলবামাত্র ওদের নিয়ে এলেন।

ওদিকে বেলা অবসান প্রায়; রায় মহাশয়ের আরাম-কুরসী পুষ্পোদ্যানে দেওয়া হইল; তিনি তথায় গিয়া বসিলেন। বসিয়া হরেন্দ্র ও নয়ন-তারার সহিত, সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল।

ইহার পর হরেন্দ্র যে কয়দিন রহিলেন, রায় মহাশয়ের প্রণীত সংস্কৃত স্তুতিটীর বাঙ্গালা অনুবাদটী আবৃত্তি করিবার ভার তাঁহার উপরে অর্পিত হইল। তদ্ভিন্ন বৈকালে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া রায় মহাশয়কে শুনাইতেন, ততক্ষণ নয়ন-তারা অপরাপর কার্য্য দেখিতেন, কিংবা টুনী পটলাকে লইয়া খেলিতেন। কখন কখনও টুনী পটলাকে পিতার কাছে বসাইয়া তাঁহারা উভয়ে বোটানির স্পেসিমেন সংগ্রহ করিতে যাইতেন; কখনও বা দুই জনে কথাতে মগ্ন হইয়া নদীর ধারে বেড়াইতেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, জানিতে পারিতেন না।

যাহার যাহা স্বভাব কোথায় যায়! টুনী ও পটলা এখানে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই গাভীদ্বয়ের রাখাল-বালকের সাহায্যে একটী ক্ষুদ্র প্রাণি-বাটিকা প্রস্তুত করিল। রাখাল-বালক জলা হইতে হাঁসের বাচ্ছা, ডাকপাখীর বাচ্ছা, নদীর কূল হইতে গাঙ্গ-শালিকের বাচ্ছা ধরিয়া আনে, আর টুনী, পটলা

তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। এজন্য তাহারা গোয়ালের পার্শ্বে একটা ঘর বাঁধিয়া লইয়াছে। সেখানে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে অনেক সময় থাকে। একদিন নয়ন-তারা ভাবিলেন, "দেখি দেখি ওরা সর্ব্বদা ওখানে কি করে"; গিয়া দেখেন, জানোয়ারে ঘরটীকে পূর্ণ করিয়াছে; পূর্ব্বোক্ত বাচ্ছাগুলি ত আছেই, তদ্ভিন্ন একটী জলের গামলাতে কয়েকটা ছোট ছোট কচ্ছপ রাখিয়াছে। দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পিতার নিকট আসিয়া সমুদয় বর্ণন করিলেন। সকলে হাসিতে লাগিলেন।

যে কয়দিন হরেন্দ্র থাকিলেন, এইরূপ সুখে দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু রায় মহাশয়ের শরীরটা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে হরেন্দ্র বাড়ীতে গেলেন। রায় মহাশয় বলিয়া দিলেন, "ফের্‌বার সময় কয়েক দিন থেকে যেও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্র চলিয়া গেলে রায় মহাশয়ের শরীরটা দিন দিন আরও খারাপ হইতে লাগিল। উদরের বেদনাটা ও তৎসঙ্গে জ্বরটা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। নয়ন-তারা বোট পাঠাইয়া দিয়া শান্তিপুর হইতে একজন ডাক্তার আনাইলেন। তিনি কিছু বিশেষ করিতে পারিলেন না। অবশেষে পিতাকে লইয়া চুঁচড়াতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। হরেন্দ্রকে পত্র লিখিলেন, "আপনি কত দিনে ফিরবেন? বাবার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্চে। আমরা চুঁচড়াতে ফিরে যাব মনে করছি, যদি আপনি শীঘ্র আসেন, এক সঙ্গে যাব, নতুবা আমি একাই বাবাকে নিয়ে ফিরে যাব।" হরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—"আমি ১০।১২ দিন পরেই ফিরবো, যদি শরীরটা বড় খারাপ হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।" প্রত্যুত্তরে লেখা হইল, "আপনি এলেই যাওয়া হবে। যত শীঘ্র পারেন আস্‌বেন।"

হরেন্দ্র কয়েক দিন বাড়ীতে জননীর কাছে থাকিয়া ও বাড়ী ঘর মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়া ৫। ৭ দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন।

জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে দেশের অবস্থা কিরূপ হয় সকলেই জানেন। দিবাভাগে কিরূপ অগ্নিবৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই দারুণ গ্রীষ্মে সেই মরুসম দ্বীপের মধ্যে বাস করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রায় মহাশয়ের জন্য দিন রাত্রি টানা পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রীষ্মের উত্তাপজনিত ক্লেশ নিবারণ হয় না। শেষ রাত্রে যা একটু নিদ্রা হয়, তদ্ভিন্ন রাত্রির অধিকাংশ কাল অনিদ্রাতেই যায়।

হরেন্দ্র পৌঁছিলেই নয়ন-তারা চুঁচড়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। চুঁচড়াতে পত্র লেখা হইল। বোটের সঙ্গে যাইবার জন্য একখানি বড় নৌকা যোগাড় করা হইল।

এমন সময়ে হরেন্দ্রের আসার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এমন মেঘাড়ম্বর প্রায় দেখা যায় না! বোধ হইতে লাগিল, সে অন্ধকারে সূচি ফুটাইলে বুঝি সূচি বিদ্ধ হয়। রাত্রি ১০টা কি ১০॥০টার সময়, সবে নয়ন-তারা পিতার মশারিটী ফেলিয়া দিয়া নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া টুনীকে সরাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে হু হু করিয়া ঝড় ডাকিয়া আসিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি, তেমনি বজ্রধ্বনি। বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রতি সেকেণ্ডে এক একটী বাজ পড়িতেছে! নিমেষে নিমেষে, বিজলী চমকিতেছে।

ঝড় আরম্ভ হইলেই, তিনি লণ্ঠনটী লইয়া পিতার ঘরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন পিতার শয্যার একপার্শ্বে টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতেছে। তখন বাধ্য হইয়া পিতাকে জাগাইতে হইল। তিনি ও হরেন্দ্র ধরাধরি করিয়া তাঁহার খাটখানি এক পাশে সরাইয়া দিলেন; দিয়া পিতাকে শয়ন করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দিকেও জল পড়িতে লাগিল। তখন সে ঘর হইতে, পিতাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন ও নিজের শয্যাতে টুনীর পার্শ্বে শয়ন করাইলেন। তৎপরে অপরাপর ঘরের দ্রব্য সামগ্রী সামলাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন স্মরণ হইল, গাভী দুটীর গোয়াল ঘর ও চাকরদের থাকিবার ঘর বুঝি পড়িয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ পাখাটানা লোকটাকে দিয়া চাকরদিগকে ডাকাইলেন। গাভী দুটীকে আনাইয়া বারাণ্ডার এক দিকে একটু জায়গা ঘেরা ছিল, তাহার ভিতর রাখিলেন। চাকরেরা বাঙ্গলার বারাণ্ডাতে উঠিল, কিন্তু ঝড়ের দাপটে সেখানে তিষ্ঠান ভার। নয়ন-তারা তাহা অনুভব করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বৈঠক ঘরের মধ্যে আনিলেন ও এক পার্শ্বে বসাইলেন; নিজে হরেন্দ্রের সহিত অপর পার্শ্বে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঝড় আর থামে না। দুই ঘণ্টা পরে ঝড় যদি থামিয়া গেল, বৃষ্টি ও বজ্রপাত আর থামে না। সমুদায় থামিতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। তখন গিয়া তিনি নিজ শয়ন-মন্দিরে একখানি কোচের উপরে একটু অঙ্গ রাখিলেন। হরেন্দ্র গিয়া পটলার সহিত নিজের শয্যাতে শয়ন করিলেন। সে রাত্রে আর কাহারও নিদ্রা হইল না।

স্থানান্তরিত হওয়াতে সে রাত্রে রায় মহাশয়েরও নিদ্রা হইল না। প্রাতে তাঁহার শরীর বড়ই খারাপ বোধ হইতে লাগিল। হরেন্দ্র বোট লইয়া শান্তিপুর হইতে ডাক্তার আনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বোটে করিয়া ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন দেখিয়া টুনী পটলাও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল; তাহারা ত চিন্তার অংশ লয় না, কিন্তু আমোদের অংশ চায়! বোটে করিয়া পারে যাইবে, এই মহা উৎসাহ। নয়ন-তারা সে উৎসাহে বাধা দিলেন না। তাহারাও হরেন্দ্রের সঙ্গে গেল।

ইহারা যাওয়ার পর বেলা ৮৷৹টা কি ৯টার সময় রায় মহাশয় একবার নিভৃতে গেলেন। নয়ন-তারা তাঁহার ঘরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আসিলেই ঔষধ খাওয়াইবেন। পিতা ঘরে আসেন না। অবশেষে টানাপাখার ছোকরাটাকে পাঠাইয়া দিলেন, "দেখ ত বাবা কি করছেন।" সে আসিয়া বলিল, "বাবু মাটীতে পড়ে আছেন।" শুনিবামাত্র কে যেন তাঁহাকে আসন হইতে হঠাৎ আকাশে তুলিয়া ফেলিল! দৌড়িয়া গিয়া দেখেন, রায় মহাশয় মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে পাশ ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—"বাবা! বাবা! এমন করে আছ কেন বাবা?"—সাড়া শব্দ নাই; নাড়িতে বান্ শরীরে স্পন্দ নাই; নাকে হাত দিয়া দেখেন, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নাই। তখন ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল;

হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; যেন আর ধরিবার শক্তি নাই। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইলেন;—বাবাকে তুলে নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু সাহায্য করে কে? চাকর বাকর কেহই নাই, সকলে বোটে বাজার করিতে পারে গিয়াছে। অবশেষে পাখাটানা ছোকরাটাকে পায়ের দিকে ধরিতে বলিয়া নিজে মাথার দিকে ধরিলেন। সে আট নয় বৎসরের বালক সে সেই প্রকাণ্ড শরীর কিরূপে সামলাইবে। সমগ্র দেহের ভারটী নয়ন-তারার উপরেই পড়িয়া গেল। বিপদে মানুষের কোথা হইতে বল আসে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! মায়ে যেমন শিশুটীকে লইয়া যায়, তেমনি সেই কোমলাঙ্গী বালিকা স্বীয় পিতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাকে যখন শয্যাতে ফেলিলেন, তখন নিজের আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের হাড় যেন থট্ করিয়া সরিয়া গিয়াছে, আর কোমর সোজা করিতে পারিতেছেন না। তদবস্থাতেই মরিয়া কুটিয়া জল আনিলেন; পিতার মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; পাখাটানা ছেলেটা খুব বাতাস করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিতে করিতে রায় মহাশয় চক্ষু মেলিলেন; তখন নয়ন-তারার ধড়ে প্রাণ আসিল। ওদিকে হরেন্দ্র প্রভৃতি ডাক্তার লইয়া উপস্থিত। এখন দুই রোগীর চিকিৎসা আবশ্যক। হরেন্দ্র নয়ন-তারারও চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু পাছে পিতার দুশ্চিন্তা বাড়ে এই ভয়ে তিনি আপনার বেদনার কথা অধিক বলিলেন না; মরিয়া কুটিয়া নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পিতাকে এইমাত্র বলিলেন—"ও কিছু নয়, তোমাকে তুলে আন্‌বার সময় কোমরটাতে একটু লেগেছে, ও সেরে যাবে।"

তৎপর দিনই চুঁচড়া যাত্রা করা হইল। চুঁচড়াতে পৌঁছিলে পরিবার পরিজন রায় মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। রায় মহাশয়কে চেয়ারে বসাইয়া চাকরেরা বহিয়া লইয়া গেল; তৎপশ্চাৎ যখন আবার দুই তিন জনে দুই হাতে ধরিয়া নয়ন-তারাকে ঘাট হইতে লইয়া চলিল, তখন জননী কাঁদিতে লাগিলেন—"মায়ে! একি সারান সারিয়ে আন্‌লি রে।"

বাড়ীতে আসিয়া পিতার আদেশে তাঁহার শয়ন-গৃহের এক পার্শ্বেই নয়ন-তারার শয্যা দেওয়া হইল। পিতা বলিলেন,—"ওকে আমার কাছেই রাখ, ওকে না দেখ্‌লে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না।" পিতা-পুত্রী উভয়ের চিকিৎসা চলিল।

এত অসুখের মধ্যে নিত্য প্রাতে সপরিবারে ভগবানের স্তুতি বন্দনার নিয়মটী দৃঢ়রূপে রক্ষিত হইতে লাগিল। রায় মহাশয় এবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, যে এ সম্বন্ধে অগ্রে যে কিছু ত্রুটি হইতে দিয়াছেন, তাহা আর হইতে দিবেন না; আর নাস্তিকের ন্যায়, সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতাকে ভুলিয়া গৃহধর্ম্ম করিবেন না। পৌঁছিয়াই হরেন্দ্রকে বলিলেন, "এখনত কয়েক দিন নয়ন-তারা উঠ্‌তে পার্‌বে না, তুমি কি কয়েক দিন সকাল সকাল উঠে এসে, সংস্কৃত স্তুতিটা ও তাহার অর্থটা পড়তে পার্‌বে না?" হরেন্দ্র তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে কার্য্য চলিল। প্রাতঃকালে সন্তানগণ সকলে উঠিয়া পিতার রোগ-শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হয়; হরেন্দ্র আসিয়া যোটেন, সৌদামিনী ও টুনী গান করেন, হরেন্দ্র স্তুতিটী পাঠ করেন। এইরূপ চলিল। পিতা-পুত্রীতে স্বীয় স্বীয় শয্যাতে কোনও প্রকারে উঠিয়া বসিয়া যোগ দেন। এতদ্ভিন্ন কর্ত্তার অনুরোধে বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রতিদিন বৈকালে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন; এবং মহেন্দ্রনাথ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া ভক্তি-সঙ্গীত গাইয়া শুনাইতে লাগিলেন। এইরূপে রায় মহাশয়ের শেষ দিনগুলি ভগবানের গুণানুবাদেই অতীত হইতে লাগিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই নয়ন-তারা উঠিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন, যদিও মেরুদণ্ডের ব্যথাটা একেবারে গেল না। রায় মহাশয়ের পীড়ার বৃদ্ধিটাও হ্রাস হইল।

তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রথম দিন হইতেই চুঁচড়ার ও কলিকাতার বন্ধুবান্ধব অনেকে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তারাপদ রায় মহাশয়ের ত কথাই নাই, জ্যেষ্ঠের ও নয়ন-তারার পীড়ার বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া চুঁচড়াতেই বাস করিতে লাগিলেন, এবং এখান হইতেই নিত্য কলিকাতা যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের শেষে যোগেশ বারিষ্টার হইয়া দেশে আসিলেন। বহু দিনের পর স্বদেশাগত পুত্রকে পাইয়া পিতামাতার মনে অপার আনন্দ হইল। ভাই ভগিনীগণও মহা আদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। অন্য সময় হইলে, তাঁহার প্রত্যাগমন নিবন্ধন বাড়ীতে কত ভোজ, কত আমোদ প্রমোদ হইত, কিন্তু যে দুর্ভাবনার মধ্যে তাঁহাকে গৃহে পদার্পণ করিতে হইল, তাহাতে আর আমোদ প্রমোদের অবসর থাকিল না। তিনি কয়েক দিন চুঁচড়াতে থাকিয়াই কলিকাতায় গেলেন; সেখানে হাইকোর্টে নাম লিখাইলেন ও একটা থাকিবার আড্ডা করিয়া, ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় একটু সামলাইয়াই জুলাইএর প্রথমে একদিন কনিষ্ঠ সহোদরকে গোপনে বলিলেন, "এ রোগে আমি যে বাঁচব এমন মনে হয় না, আমার বিষয় আশয়ের একটা ব্যবস্থা কর্‌তে চাই, তুমি গোপনে একজন উকীলের কাছথেকে একটা লেখাপড়া করিয়ে আন, কথাটা কেবল তুমি জান্‌বে, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কারুকে বল্‌বে না। আর একটা কথা, আমি মর্‌বার পূর্ব্বে নয়ন-তারা ও সন্তুর বিয়ে দিয়ে যেতে চাই। সুরেশ প্রভৃতির ইচ্ছে নয়, যে হরেন্দ্রের সঙ্গে নয়ন-তারার বিয়ে হয়, তাত তুমি জান, তুমি সে বিষয়ে কি বল?"

কনিষ্ঠ রায়। কেন তার দোষটা কি, সে রাঁধুনীর ছেলে, সেটা ত তার প্রশংসার বিষয়; অমন ছেলে কটা পাওয়া যায়? আমার খুব মত আছে।

রায় মহাশয়। আমিত তাই বলি, ও আমার সন্তানের মত, ওকে আমি ভাল করে দেখেছি, যাহোক মাসে ৭৫৲ টাকা মাহিনা ত পায়, তারপর আমিও নয়ন-তারাকে কিছু দিয়ে যাব, তাও ত সে পাবে, তাতেই তাদের বেশ চলে যাবে। তারপর তার অবস্থা কি এমনি থাক্‌বে? তুমি নয়ন-তারা ও সন্তুকে একবার বলে দেখ।

একদিন নয়ন-তারা বাগানে পিতার জন্য ফুল তুলিতেছেন, এমন সময়ে কনিষ্ঠ রায় সেখানে উপস্থিত। বলিলেন, "নয়ন-তারা এদিকে একটু এস, এই বেঞ্চে আমার কাছে বসো, গোপনে একটু কথা আছে।

নয়ন-তারা গিয়া বেঞ্চে তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন।

কি কথা?

কনিষ্ঠ রায়। দাদাকে যে সাংঘাতিক রোগে ধরেছে, তাতে আর নিস্তার নেই, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ?

নয়ন-তারার চক্ষে জল আসিল—"আমাকে আর এমন কথা কেন শোনাচ্ছ কাকা? যতই ভুলে থাকি ততই ভাল।

কনিষ্ঠ রায়। দাদার মনে একটা ইচ্ছে হয়েছে, তাই তোমার মত জান্‌তে চাচ্চি।

নয়ন-তারা। কি ইচ্ছে হয়েছে বল, আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি তা পূর্ণ হয়, আমরা করবো।

কনিষ্ঠ রায়। তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, যে মর্‌বার আগে তোমার ও সদুর-বিয়ে দিয়ে যান।

যেই এই কথা বলা, অমনি নয়ন-তারা দুই হাতে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।—"কাকা! কাকা! তুমি কি কথা আমায় শোনালে, কি করে এ কঠিন কথা বল্‌লে? আমার বাবা মারা যান, আর আমি বিয়ে করে সংসার কর্‌তে যাব! যখন বাবার কাছে আমার দিন রাত্রি থাকা উচিত, তখন পরের ঘরে যাব! যখন আমাদের আর কোনও চিন্তা থাকা উচিত নয়, তখন আমি আপনার সুখেরই চিন্তায় রত হব! তুমি পুরুষ বলেই এমন কথা বল্‌তে পেরেছ, মেয়ে হলে পার্‌তে না। আমার বাবা চলে যাচ্চেন, এমন বাবা চলে যাচ্চেন, আমি তাঁকে এখন কি ত্যাগ করে যাব!

বলিতে বলিতে পিতৃব্যের কোলে মুখ লুকাইয়া, "বাবা, বাবা!" করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ রায় আপনাকে ভয়ানক অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন; অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কি দুষ্কর্ম্মই করা গিয়েছে, বাস্তবিক এমন সময়ে প্রস্তাবটা করা ভাল হয় নি।"

এ ব্যাপারটা এই উভয়ের মধ্যে গোপন রহিল। ইহার পরে কনিষ্ঠ রায়ের সৌদামিনীর নিকট প্রস্তাব করিবার উৎসাহটা কমিয়া গেল। কিন্তু কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তাহারও নিকট প্রস্তাব করিলেন। সৌদামিনীও অনুভব করিতে লাগিলেন, যে পীড়িত পিতাকে ফেলিয়া যাওয়া

ভাল দেখায় না। অথচ সেই সঙ্গে শীঘ্র পরিণীত হইবার জন্য গোবিনের আগ্রহ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, বাড়ীর লোকে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া শেষে তাঁহাকে এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে, বন্ধুবান্ধব প্রতিদিন অপেক্ষা করিতেছে, তিনি নূতন বাড়ী কিনিয়া উত্তমরূপে সাজাইয়াছেন, নূতন গাড়ী, ঘোড়া কিনিয়াছেন, সকলি প্রস্তুত কেবল গৃহিণী গেলেই হয়, এ সকল কথাও সৌদামিনীর মনে আসিল। তিনি কতক ইচ্ছা কতক অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "বাবা যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে যেমন তাঁর ইচ্ছে তাই হোক্।"

ইহার পরেই সৌদামিনীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। স্থির হইল যে বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবে, তদ্ভিন্ন রায় মহাশয় যৌতুক স্বরূপ তাঁহার নামে এককালীন বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ও মাসিক ১০০৲ একশ টাকা পকেট খরচ দিবেন, তাহাতে অপর কাহারও হাত থাকিবে না।

বিবাহ পদ্ধতি কিরূপ হইবে? সে বিষয়ে রায় মহাশয় স্থির করিলেন, যে তিনি নিজে প্রাচীন ও নব্য পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক একটী পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাঁহার প্রিয় বন্ধু মহেন্দ্রনাথ সেই পদ্ধতি অনুসারে পৌরহিত্য কার্য্য সমাধা করিবেন। গোবিন তাহাতেই সম্মত হইলেন। রায় মহাশয় এত অসুস্থতার মধ্যেও দুই তিন দিন মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসিয়া একটী পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই পদ্ধতি অনুসারে আগষ্ট মাসের ১২ই সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে সুরেশ কন্যাকর্ত্তার কাজ করিলেন। বিবাহোৎসবে অধিক লোক নিমন্ত্রণ করা হইল না। তবুও নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বড় কম হইল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকল দলের সহিত রায় মহাশয়ের আত্মীয়তা, সুতরাং সকল দলের বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলে আনন্দের সহিত সভাস্থ হইয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। রায় মহাশয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার্থ সভাস্থলে যাইতে পারিলেন না, কিন্তু চাকরের স্কন্ধে ভর করিয়া নীচের বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন; বন্ধুবান্ধব সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন।

এই যে দুই ঘণ্টা কাল সেখানে ছিলেন, তাহাই বোধ হয় তাঁহার পীড়াকে সঙ্কটে উপনীত করিল; কারণ সৌদামিনীর বিবাহের পরেই তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন; পীড়ার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে প্রচার হইল যে, কালীপদ রায়ের অন্তিম কাল উপস্থিত। এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে চুঁচড়া সহরে মানুষের মনে যে ম্লানতা উপস্থিত হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। যাহারা তাঁহার মুখ কখনও দেখে নাই, কেবল দূর হইতে তাঁহার গুণাবলীর কথা শুনিয়া আসিতেছিল, তাহারা সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। দোকানি, পশারি, রাস্তার লোক পরস্পর দেখা হইলে বলাবলি করিতে লাগিল—"যাঃ এত দিনে চুঁচড়া সহর নিবে যায়, একটা মানুষের মত মানুষ চলিল।" প্রাতে ও সন্ধ্যাতে লোকে রায় মহাশয় কেমন আছেন, সেই সংবাদ লইতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার আত্মীয় স্বজন মহলে ঘোর ব্যস্ততা পড়িয়া গেল। গোবিন ও সৌদামিনী চুঁচড়াতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বড়িশার বাড়ী হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ও বাড়ীর প্রাচীনা মহিলারা কয়েক জন আসিয়া একদিন সমস্ত দিন থাকিয়া গেলেন। এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নী আসিয়া একদিন থাকিয়া গেলেন।

এদিকে রায় পরিবারের অবস্থা বর্ণনাতীত। সকলের মুখ বিষণ্ণ। কর্ত্রী ঠাকুরাণী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। কয়েক দিন হইতে তিনি আর কর্ত্তার পার্শ্ব ছাড়িতেছেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ চাপিয়া কাঁদিতেছেন, আর নয়ন-তারা ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছেন—"ছি মা, বাবাকে অস্থির করো না, রোগ বেড়ে যাবে।" কর্ত্তা নিজে কিছুমাত্র অস্থির হইতেছেন না। ধীর ভাবে গৃহিণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, "আর কেন কাঁদ? ঈশ্বরকে কেন ধন্যবাদ কর না, এতকাল দুজনে পরম সুখে বাস করেছি, সুসন্তান সব মানুষ করে তুলেছি, এখন তোমার ভার ওদের উপরে দিয়ে যেতে পারছি। দুজনে একসঙ্গে যেতে পারলেই ভাল হ'ত কিন্তু কি করবে, এ সব ত মানবের হাত নয়। ছি কেঁদ না, যে কয়টা দিন আছি, আমার কাছে বসে কেবল ঈশ্বরের নাম কর। তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দেও।" গৃহিণী বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন।

নয়ন-তারা পিতার ঘরের পার্শ্বেই মাতার জন্য একখানি বড় খাট দিয়াছেন, সেই খাটে তিনি মায়ের সঙ্গে শয়ন করিয়া থাকেন। এখন দিন রাত্রি রোগীর নিকট একজন না একজন থাকা আবশ্যক হইতেছে। তদনুসারে দিনের বেলা গৃহিণী, পটলা ও নন্দরাণী থাকেন, রাত্রে সুরেশচন্দ্র, গোবিন, সৌদামিনী, হরেন্দ্র, অবিনাশ ও নয়ন-তারা জাগেন, এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত নয়ন-তারা ও সুরেশ পিতার নিকটে থাকেন, তৎপরে গোবিন ও সৌদামিনী তাঁহার স্থান অধিকার করেন, নয়ন-তারা গিয়া পার্শ্বের ঘরে মাতার নিকটে শয়ন করেন, গোবিন, সৌদামিনী রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকেন; তৎপরে হরেন্দ্রকে জাগাইয়া দিয়া তাঁহারা শয়ন করিতে যান। হরেন্দ্র সন্ধ্যার পরে আসিয়াই পটলার ঘরে একখানি খাটে শুইয়া থাকেন। হরেন্দ্র রাত্রি ৩টার সময়ে নয়ন-তারা ও অবিনাশকে ডাকিয়া দিয়া নিজে শয়ন করিতে যান। এইরূপ শুশ্রূষা চলিয়াছে।

সকল চেষ্টাই বিফল হইল! ভাল ভাল ডাক্তার দেখাইতে আর বাকি রহিল না। চিকিৎসাতে যাহা হয়, শুশ্রূষাতে যাহা হয়, সকলি হইল, কিছুতেই কুলাইল না। অক্টোবর মাসের ১লা ডাক্তারেরা বলিলেন, আর দুই একদিন। সেই দিনই কলিকাতার ছোট কর্ত্তার বাড়ীতে ও চুঁচড়ার অপর বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া হইল। কেহ কেহ সেই রাত্রে ও অপরেরা তৎপর দিন প্রাতে আসিলেন। কিন্তু সেই প্রাতেই প্রাণবায়ু রায় মহাশয়ের দেহকে পরিত্যাগ করিল। সে মৃত্যু শয্যার দৃশ্য কি বর্ণন করিব! তিন পরিবারের লোকের আর্ত্তনাদে গগণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ মুমুর্ষু সাধু পুরুষের মস্তকের নিকট মুদিত নেত্রে বসিয়া আছেন; দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে; আর কেবল বলিতেছেন—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" গৃহিণী ঠাকুরাণী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর ন্যায় মুমুর্ষু পতির বক্ষঃস্থলে মাথা দিয়া পড়িতেছেন ও চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"ওগো আমায় একলা ফেলে কোথা যাওগো; ওগো একদিনও তোমা ছাড়া থাকিনি গো।" নয়ন-তারা তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন;—"মাগো মা, ওমা বাবাকে শান্তিতে

যেতে দেও, ওমা মহেন্দ্রবাবু ভগবানের নাম কর্‌ছেন, বাবাকে ঈশ্বরের নাম শুন্‌তে দেও।" মহেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে গুণ গুণ স্বরে একটী গান করিতেছিলেন, নয়ন-তারা এই কথা বলাতে গানটী উচ্চৈস্বরে ধরিলেন, তাহার প্রথম পদটী এই—

"ওহে ভবের নাবিক একবার দাঁড়াও এসে ভব-নদীর কূলে ;"

তিনি যখন গান ধরিলেন, তখন ক্রন্দনের রোল কিয়ংক্ষণের জন্য থামিল, কিন্তু সে কতক্ষণ! প্রথম পদটী দুইবার না গাইতে গাইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী নয়ন-তারার হাত ছাড়াইয়া আবার আসিয়া পতির বক্ষের উপরে পড়িলেন। সেই গোলে মালে মহেন্দ্রনাথের গান থামিয়া গেল। চুঁচড়ার অপর বাড়ীর বৃদ্ধাদের একজন বলিলেন, "ওগো এমন সাধু পুরুষ আর হয় না, ওগো ওঁকে গঙ্গাতে নিয়ে চল," আর একজন বলিলেন,—"আহা এইত গাঙ্গাতীরে স্বর্গারোহণ হচ্চে।"

ওদিকে চুঁচড়া সহরের যত বড় বড় লোক সকলে নীচের বৈঠক ঘরে সমবেত। সেখানে তারাপদবাবু, গৌরীপদবাবু, সুরেশ প্রভৃতি নিঃস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছেন। সমাগত ভদ্রলোকেরা এক একজন এক একবার রায় মহাশয়ের এক একটী গুণের কথা বলিতেছেন। এমন সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত, সুরেশচন্দ্র উঠিয়া তাঁহাকে সমুদয় সংবাদ দিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উপরে লইয়া গেলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে দেখিয়াই গৃহিণী আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ওগো যাঁকে তুমি এত ভালবাস্‌তে সেই বিদ্যেরত্ন মশাই এসেছেন গো, চেয়ে দেখ, একবার কথা কও গো!" বিদ্যারত্ন মহাশয় আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। এইরূপে চুঁচড়ার কালীপদ রায় চলিয়া গেলেন। চুঁচড়া সহরের অর্দ্ধেক লোক তাঁহার শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গেল।

রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন, নয়ন-তারার মস্তকে যেন গুরুতর বোঝা পড়িয়া গেল। তিনি জননীকে লইয়া পড়িলেন। পরিবারস্থ সকলে দুই একদিনের মধ্যে সাম্‌লাইয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না। নয়ন-তারা কাঁদিবেন কি, ভাবিবেন কি, মাতাকে লইয়াই বিব্রত।

সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় জননীর সঙ্গে সঙ্গে আছেন; স্নান করাইতেছেন; খাওয়াইতেছেন; রাত্রে আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া থাকিতেছেন।

রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরদিন হইতেই পরিবার মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিল, কিরূপে তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। সুরেশ, যোগেশ বলিলেন, "শ্রাদ্ধ আবার কি? একটা প্রাচীন কুসংস্কার রক্ষা করা কেন?" তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল, তাঁহারা সেরূপ কিছু করিতে ইচ্ছুক নন। ইহাতে জননী ও নয়ন-তারা মনে বড় ক্লেশ পাইলেন। অবশেষে পিতৃব্যের পরামর্শে স্থির হইল, যে দেশীয় রীতির অনুসারে কন্যাগণ চতুর্থ দিবসে ঈশ্বরোপাসনা পূর্ব্বক পিতার স্মরণার্থ দান ধ্যান করিবেন। দশাহের পর পুত্রেরা কিছু করিবেন কিনা, তাহা পরে স্থির হইবে।

তদনুসারে চতুর্থ দিবসে মহেন্দ্রনাথ প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা করিলেন; এবং কন্যারা চারি দিকের দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নানারূপে প্রায় সহস্রাধিক টাকা দান করিলেন। পিতা সংস্কৃত বিদ্যার অনুরাগী লোক ছিলেন, সেজন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হাত দিয়া নয়ন-তারা সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রায় সহস্রাধিক টাকা বিতরণ করিলেন। তিনি সে দিন সমস্ত দিন পিতার শূন্য শয়ন-মন্দিরে, তাঁহার শূন্য শয্যার পার্শ্বে, তাঁহার প্রতিকৃতির সম্মুখে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বর-চিন্তাতে কাটাইলেন।

অগ্রেই বলা হইয়াছে, ৬ই অক্টোবর নয়ন-তারার জন্মদিন। সে কথা এ শোকের সময়ে কাহারও মনে নাই। কিন্তু নয়ন-তারার মনে আছে। সে দিন প্রাতে উঠিয়া তিনি জননীকে তুলিয়া, মুখ হাত ধোয়াইয়া, তাঁহার পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, নিজে ঘরে গিয়া দ্বার দিলেন। অনেকক্ষণ গেল তাঁহার আর দেখা নাই;—বেলা বাড়িল, তিনি আর দ্বার খোলেন না। অবশেষে নন্দরাণী আস্তে আস্তে পার্শ্বের দ্বারের খড়খড়ি তুলিয়া দেখেন, তিনি নিজ শয্যার উপরে পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া, "বাবা বাবা!" করিয়া ভয়ানক কাঁদিতেছেন। তিনি আর ডাকিতে সাহস করিলেন না। এই কথা কেমন করিয়া জননী শুনিতে পাইলেন; অমনি মনে পড়িয়া গেল, যে সে দিন নয়ন-তারার জন্মদিন; অমনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো নয়ন-তারার জন্মদিনে তুমি কোথায় রৈলে গো,

এসে আশীর্ব্বাদ কর গো।" মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিবামাত্র নয়ন-তারা উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া, বাহিরে আসিলেন ও জননীকে ধরিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। "ছি মা কেঁদ না, আমার জন্মদিনে অমঙ্গল করো না, আচ্ছা বাবা নাই, তুমিত আছ, তুমি পদধূলি দেও, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।" এই বলিয়া মাতার পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দিলেন। "আমার জন্মদিনে অমঙ্গল করো না," এই কথাটা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মনে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন ও নয়ন-তারার মস্তক নিজ বক্ষে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মাতা-কন্যার ভালবাসার উচ্ছ্বাসে শোকটা একটু শান্ত ভাব ধারণ করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয় চলিয়া যাওয়ার দিন হইতে নয়ন-তারা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহ মন হইতে এক প্রবল শক্তি অন্তর্হিত হইল; তিনি বাস্তবিক অশরণ হইলেন। ভ্রাতৃগণের মতি গতি অন্যরূপ, তাঁহাদের প্রতি নির্ভর করিবার উপায় নাই; জননী নামে অভিভাবিকা, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় দিবার শক্তি নাই। তিনি নিজে কি আর সেই সংসারটা শাসনাধীন রাখিয়া চালাইতে পারিবেন? আর কি সকলে তাঁহাকে মানিয়া চলিবে? পিতার বলে তাঁহার বল ছিল, এখন তাঁহার কি বল রহিল? দারুণ শোকের মধ্যে এ সকল চিন্তা ও তাঁহার মনে আসিতে লাগিল।

শোকের মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প করিলেন, যে পিতার স্মৃতিকে পরিবার মধ্যে জাগরূক রাখিবেন; পিতার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। তাঁহার এক নিয়ম প্রাতে উঠিয়া সপরিবারে ভগবানের নাম করা। এটাকে তিনি দৃঢ়ভাবে ধরিলেন। প্রতিদিন প্রাতে পিতার শয়ন-গৃহে শূন্য খাটের চারিধারে সকলে সম্মিলিত হইয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এ নিয়মটা চলিল; তিনি নিজে ভক্তি-সঙ্গীত করিয়া, ও শোকের বিনোদনের উপযোগী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া জননীকে শুনাইতে লাগিলেন।

এক প্রকার স্থিরই ছিল যে রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্রেরা কিছু করিবেন না; কিন্তু পিতৃব্য মহাশয় আসিয়া তাহাদিগকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন;—"তোরা কিরূপ পাষণ্ড! তাঁর ধনগুলো নিবি তাঁর স্মরণার্থ কিছু কর্‌বি না? শ্রাদ্ধ করাতে দোষ কি? আর ব্যাপারটাই বা বেশি কি? মেজদা, ঈশ্বরের নাম শুন্‌তে ভালবাস্‌তেন; মহেন্দ্রবাবু তাঁর প্রিয় বন্ধু, তিনি একটু ঈশ্বরোপাসনা কর্‌বেন, তার পর কিছু দান ধ্যান করা যাবে।" পিতৃব্যের তিরস্কারে এটাও স্থির হইয়া গেল। দশাহের পর, রায় মহাশয়ের সমুদয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আবার নানাপ্রকারে প্রায় তিন চারি হাজার টাকা দান হইল।

শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যার পর নয়ন-তারা ভ্রাতৃগণের সমক্ষে পিতৃব্যের হস্তে পিতার উইলখানি সমর্পণ করিলেন। সেখানির কথা পিতৃব্য জানিতেন, কিন্তু পরিবারের অপর কেহ জানিতেন না; পিতা নয়ন-তারাকে রাখিতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর তোমার ভাইদের ও তোমার কাকাকে একত্র করে তাদের হাতে দিও। আর কাহাকেও একথা বলো না।"

উইলে লিখিত অপরাপর বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্থূল স্থূল কয়টী উল্লেখ যোগ্য; প্রথম—বাড়ীখানি গৃহিণী ও অবিবাহিতা কন্যাদিগের ব্যবহারার্থ দিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের দেহান্ত হইলে পুত্রেরা সমান ভাগে পাইবেন; দ্বিতীয়—নয়ন-তারাকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা ও মাসিক বৃত্তি দেড় শত টাকা দিয়া গিয়াছেন; তিনি বিবাহের পরেও তাহা পাইবেন; তৃতীয়—টুনী ও পটলার অভিভাবকতা ভার কনিষ্ঠ সহোদর ও নয়ন-তারার হস্তে দিয়া গিয়াছেন। পটলা ও টুনীর মাসিক বৃত্তি এক একশত টাকা ও পটলার প্রাপ্য টাকার সুদের দরুণ টাকা নয়ন-তারার হস্তে দেওয়া হইবে, তিনি তাহা তাহাদের শিক্ষার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন; টুনীর একশত টাকা বৃত্তি সে বিবাহের পরেও পাইবে। তদ্ভিন্ন এককালীন বিশ হাজার টাকা পাইবে। পটলার প্রাপ্য টাকা বাদে শিক্ষা ও বিলাত যাত্রা প্রভৃতির ব্যয়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা কনিষ্ঠ সহোদর ও নয়ন-তারার হস্তে থাকিবে; চতুর্থ—গৃহিণীকে এককালীন পঁচিশ হাজার ও মাসিক বৃত্তি আড়াই শত টাকা, এবং গাড়ী, ঘোড়া, আস্‌বাব সমুদায় দিয়া গিয়াছেন; পঞ্চম—চারি

পুত্রকে দুই লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা সৎকার্য্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা, মহেন্দ্রনাথকে পাঁচ হাজার ও বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পাঁচ হাজার দান করিয়া গিয়াছেন। পত্নী ও দুহিতাদিগের মাসিক বৃত্তির জন্য রক্ষিত টাকা তাঁহাদের দেহান্তে দেশ মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রদত্ত হইবে। তিন পুত্র কনিষ্ঠ সহোদর ও নয়ন-তারা উইলের এক্‌জিকিউটার।

তারাপদ রায় মহাশয় কয়েক দিনের মধ্যেই উইলখানি আদালতে উপস্থিত করিয়া প্রোবেট লইলেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেশ ও যোগেশের প্রাপ্য টাকা তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। অপরদিগের টাকা তাঁহাদের নামে কাগজ কিনিয়া দিলেন। পটলা ও টুনীর টাকা তাঁহার নিকটেই রহিল।

পিতার উইলটা পুত্রদিগের মনঃপুত হইল কি না বুঝিতে পারা গেল না। তাঁহারা কেহ কিছু বলিলেন না, বরং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে বেশ ব্যবস্থা হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর পর এক মাস গত হইতে না হইতেই নয়ন-তারার আশঙ্কা কাজে ফলিতে লাগিল। তিনি পিতার আদেশানুসারে যে প্রাতে ভগবানের নাম করিয়া দিনের কাজ আরম্ভ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন, ক্রমে সুরেশ ও যোগেশ সেখানে আসা বন্ধ করিলেন। কেবল তাহা নহে, সুরেশ নয়ন-তারাকে উঠিতে বসিতে—"Our Holy High Priestess; Our Mother Superior" প্রভৃতি সম্ভাষণ দ্বারা তামাসা ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে নন্দরাণী প্রাতে আসা পরিত্যাগ করিলেন। পটলাও অনুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু নয়ন-তারা তাহাকে তিন ধমকে ঠিক করিয়া লইলেন।

ইহা লইয়া ভ্রাতা ভগিনীতে একদিন অনেক বকাবকি হইল।

নয়ন তারা। দাদা! তোমার একি ব্যবহার, বাবা একটা নিয়ম করে গিয়েছেন, নিয়ম রাখ্‌তে বলে গিয়েছেন, সেই অনুসারে আমরা সকলে একটু ভগবানের নাম করি, তোমার ভাল না লাগে তুমি যাবে না, তুমি ঠাট্টা তামাসা করে অন্যকে বাঁকাও কেন?

সুরেশ। একটু ঠাট্টা সইতে পারিস্ নে, তবে আবার কি ধর্ম্ম করবি? সেকালকার মার্টারেরা প্রাণটা দিত তা জানিস্?

নয়ন-তারা। আমরা ত বয়ে গিয়েছি, আর ছেলেগুলোকে বয়াও কেন?

সুরেশ। তোমরাত বয়ে গিয়েছ বল্—"আমরাত" বলিস্ কেন? তুইত আমাদের দলে নয়; তুইত মহা ধার্ম্মিক।

নয়ন-তারা। (বিরক্ত ভাবে) তোমাদের সঙ্গেত কেউ পার্বে না। তোমাদের যা ভাল বোধ হয় করো।

এই বকাবকির পর নয়ন-তারাকে বিরক্ত করিবার মানসেই হউক, অথবা যোগেশ ও যোগেশের বন্ধুদের কুসঙ্গের দোষেই হউক, সুরেশ তাঁহার চিরদিনের অবলম্বিত সংযত ভাব শিথিল করিয়া প্রায় প্রতিদিন সুরাপান আরম্ভ করিলেন, এবং এক একদিন তাহা অতিরিক্ত মাত্রাতে যাইতে লাগিল। তবু তিনি বরং কোনও দিন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেন না; কিন্তু যোগেশ এক একদিন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। যোগেশ চুঁচড়ার বাড়ীতে আসিলে নীচের ঘরেই থাকেন, সুতরাং যাহা কিছু করেন, নয়ন-তারা দেখিতে পান না, কারণ তাঁহাকে উপরে জননীর নিকট সর্ব্বদাই থাকিতে হয়, কেবল নন্দরাণীর নিকট সংবাদ পান এই মাত্র।

একদিন যোগেশ নেশার ঝোঁকে নন্দরাণীকে অভদ্রভাবে ধরিলেন। নন্দরাণী অতি কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় পতির নিকটে গিয়া অভিযোগ করিলেন। সুরেশ সে কথা কাণেই লইলেন না।

জড়িয়ে ধরেছে তা হয়েছে কি, আমার ভাইএরা ত তোমাকে চিরদিন বোনের মত দেখে, ভালবাসে, জড়ায়, আদর করে, নূতন কথাটা কি?

নন্দরাণী। না, তুমি বুঝ্তে পার্‌ছ না, তুমি দেখলে বুঝ্তে পার্তে, ভাল ভাবে কখনই ধরে নি।

সুরেশ। যাও, যাও, তোমার মন খারাপ, আমার ভাইএরা কখনই এত অসৎ নয়, যে আপনার বাড়ীতে আপনার লোকের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করতে যাবে।

নন্দরাণী। তুমি বল্লে.বুঝ্বে না, আমি কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে আর বার হবো না।

সুরেশ। যাও গোঁড়াদের দলে গিয়ে নাম লেখাও। আমাদের মধ্যে একটা গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাবে দেখছি।

নন্দরাণী স্বীয় পতিকে বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া নয়ন-তারাকে বলিয়া দিলেন। যোগেশের সহিত নয়ন-তারার চিরদিনই একটু বিশেষ নৈকট্য। যোগেশের প্রধান গুণ এই তিনি ভগিনীর নিকট কিছুই গোপন করেন না, এবং যথার্থই অনুতপ্ত হন ও আপনাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষটা বড় দুর্ব্বল, কুসঙ্গে পড়িলে আর আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না। নয়ন-তারা নন্দরাণীর মুখে সে দিনকার বিবরণ শুনিয়া, নির্জ্জনে যোগেশকে অনেক তিরস্কার করিলেন; যোগেশ মুক্তকণ্ঠে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া, গোপনে নন্দরাণীর হাতে ধরিয়া মাপ চাহিলেন। বিবাদের কারণটা থামিয়া গেল।

কিন্তু এই ঘটনার পরে দিন দিন কলিকাতা হইতে যোগেশের অনেক অখ্যাতি শোনা যাইতে লাগিল। একবার শোনা গেল, তিনি কুসঙ্গে পড়িয়া জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার শোনা গেল, যে যেখানে সেখানে নিমন্ত্রণে গিয়া মাতলামি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল সংবাদে নয়ন-তারার মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। জননীকে গোপনে বলিলেন, "মা! সর্ব্বনাশের দিন বুঝি নিকটে এল, মেজদা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, আমরাত সামলাতে পার্‌বো না।"

আর একদিকে আর এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত! হরেন্দ্রের এ বাড়ীতে কতদূর অধিকার, তাঁহাকে সকলে কিরূপ আপনার লোক মনে করেন, তাহার পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। তাঁহার বেতন বৃদ্ধির পর টুনী পটলার পড়ান ছাড়িয়াছেন, তথাপি প্রত্যহ একবার এ বাড়ীতে না আসিলেই নয়। কিন্তু রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর হইতেই সুরেশের ভাবে হরেন্দ্র অনুভব করিতে লাগিলেন যে, সে ভবনে তাঁর অতিরিক্ত গতিবিধি সুরেশ পছন্দ করেন না। হরেন্দ্র অভিমানী মানুষ, এই ভাবটা মনে আসাতে মনে মনে এইটা কয়েকদিন তোলা পাড়া করিতে লাগিলেন। একদিন নয়ন-তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুরেশ বাবুর ভাব দেখে বোধ হয়, আমার এখানে আসা যাওয়া যেন পছন্দ করেন না, আপনার কি বোধ হয়?" নয়ন-তারা হাসিয়া বলিলেন—"জানেনই ত দাদা আপনাদের পছন্দ করেন না; আপনার আসা সম্বন্ধে যে কোনও আপত্তি আছে, তা মনে হয় না।"

যাহা হউক অল্প দিনের মধ্যে নয়ন-তারারও বুঝিতে বাকি রহিল না, যে সে ভবনে হরেন্দ্রের পূর্ব্বের অধিকার আর থাকিবে না। হরেন্দ্রকে আসিতে দেখিলেই সুরেশ কি একপ্রকার বিরাগ সূচক দৃষ্টিতে চাহিতেন, যাহার অর্থ বুঝিতে হরেন্দ্রের বাকি থাকিত না। একদিন সুরেশ কলেজ হইতে আসিয়া দেখিলেন, হরেন্দ্র ও নন্দরাণী বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন ও মহা হাসাহাসি হইতেছে। সেদিন নন্দরাণী ঘরে গেলে, তাঁহাকে বকিলেন :—

"পথে ঘাটে দাঁড়িয়ে যার তার সঙ্গে গলাগলি হাসাহাসি কর্‌তে লজ্জা করে না ?"

নন্দরাণী। (বিরক্তভাবে) যার তার সঙ্গে গলাগলি হাসাহাসি কি রকম ? হরেন বাবু কি আমাদের পর ?

সুরেশ। পর নয় ত কি ? আপনার লোকটা কিসে ? ছেলেদের মাষ্টার বৈ ত নয় ?

নন্দরাণী মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন ; কারণ হরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। কিন্তু বুঝিলেন যে, তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আত্মীয় ভাবে মিশিলে পতি বিরক্ত হইবেন, সুতরাং তদবধি একটু দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আর একদিন সুরেশ দেখিলেন, টুনী হরেন্দ্রের গলা ধরিয়া ঝুলিতেছে। ইহা দেখিয়া পছন্দ করিলেন না। সময়ান্তরে টুনীকে বকিলেন ;—

"বোকা মেয়ে দাদার গলা ধরে ঝুলিস বলে কি যার তার গলা ধরে ঝুল্‌বি ? হরেনের গলা ধরে কেন ঝুল্‌ছিলি ? তোর এত বয়স হলো, বুদ্ধি শুদ্ধি হবে কবে ?"

তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া টুনী ভয়ে কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে বলিল—"বাঃ হরেন দাদাও ত দাদা।" কিন্তু তদবধি হরেন্দ্রের কাছে যাইতে তাহারও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। সকলেই বোধ হয় মনে মনে ভাবিতে-ছেন, সুরেশ এ কাজটা ভাল করিলেন না। টুনীর মনে ভেদ বুদ্ধিটা আনিয়া দেওয়া ভাল হইল না। সে সরলা বালিকা, সে কিছুই জানিত না, তাহার সরল পবিত্র শিশুবৎ ব্যবহারে হরেন্দ্রের প্রাণে যে সুখটুকু হইত, তাহাতেও তাহাকে বঞ্চিত করা উচিত হইল না। তাহা আর বলিলে কি হইবে, যাহা

ঘটিবার ঘটিয়া গেল। ক্রমে সকল কথা নয়ন-তারার কর্ণগোচর হইল। তিনি চিন্তিত হইতে লাগিলেন—"না জানি শেষে কিরূপ দাঁড়ায়।" হরেন্দ্র ও নন্দরাণী ও টুনীর ব্যবহারে পরিবর্ত্তন দেখিয়া চিন্তিত হইলেন।

একদিন নয়ন-তারার সমক্ষে জননীর সন্নিধানে সুরেশ আপনার মনের হলাহল উদ্গীরণ করিলেন। "যে সে বাড়ীর মধ্যে আস্‌বে, সময় নেই অসময় নেই মেয়েদের ঘরে যাবে, যারা আত্মীয়তা কর্‌তে চায় না, তাদের ঘাড়ে আত্মীয়তা চাপাবে, এটা ত ভাল নয়; এটা আমি পছন্দ করি না। যাদের সঙ্গে বন্ধুতা আছে, যারা তাকে চায়, না হয় তাদের ঘরে যাক্ অন্যের ঘরে উঁকি মারে কেন?"

নয়ন-তারা বুঝিতে পারিলেন যে, হরেন্দ্র যে নন্দরাণীর ঘরে যান, তাহা সুরেশচন্দ্রের অভিপ্রেত নহে। তৎপর দিন হরেন্দ্র আসিলে তিনি বলিলেন—"আপনি এসে যদি দেখেন যে, আমি ঘরে নেই, বসে অপেক্ষা কর্‌বেন বৌএর ঘরে যাবার প্রয়োজন নেই।"

হরেন্দ্র। ভিতরের কথাটা আমাকে বলুন না; আপনাদের বৌ আর আমার কাছে আসেন না, টুনী আমাকে দেখ্‌লে পালায়, তার পর আমাকে বৌএর ঘরে যেতে বারণ কর্‌ছেন, ব্যাপারটা কি?

নয়ন-তারা। সব কথা এখন বল্‌বো না, পরে জান্‌তে পারবেন, এখন আমি যা বল্‌লাম, সেই রকম কাজ কর্‌বেন।

অভিমানী মানুষকে লইয়া কারবার করাই কঠিন। হরেন্দ্র এই বিষয়টী মনে মনে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া মস্ত একটা ব্যাপার করিতে লাগিলেন। টুনী পটলার পড়ান ছাড়িয়া দিয়া ও প্রত্যহ বৈকালে নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; ইহার পর দুই একদিন অন্তর আসিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে নয়ন-তারা জ্যেষ্ঠের প্রতি চটিয়া রহিলেন।

ক্রমেই শ্রাদ্ধ গড়াইতে লাগিল। যোগেশ আপনার নব্য বারিষ্টার বন্ধুদিগকে দুই একটী করিয়া বাড়ীতে আনিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্রে এই নিয়ম ছিল, যে আহারান্তে সুরেশচন্দ্র নব্য অতিথিদিগকে নিজ ঘরে লইয়া অল্প মাত্রায় সুরাপান করিতে দিতেন, কিন্তু এখন হইতে তাহাদিগকে সুরাপান করাইয়া আহারের স্থানে আনিতে লাগিলেন। একদিন আহার করিতে বসিয়া একজনের

ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথা ঝুলিয়া পড়িল, তিনি আর আহার করিতে পারিলেন না; আর একদিন একজন টুনীর পাশে বসিয়া তার সঙ্গে এমনি ইয়ারকী দিবার উপক্রম করিলেন, যে নয়ন-তারা ইসারা করিয়া টুনীকে নিজের নিকট তুলিয়া লইলেন। এই সকল ব্যবহারে তিনি এমনি চটিয়া গেলেন, যে বিলাতফেরত অতিথি কেহ আসিলে, আহারের স্থানে আসা অথবা টুনী পটলাকে আসিতে দেওয়া বন্ধ করিলেন। এজন্য ভাই ভগিনীতে একদিন তুমুল ঝগড়া হইল।

ইহার পরে বিলাতফেরত অতিথিদের যাতায়াত ঘন ঘন আরম্ভ হইল।

এক শনিবার নন্দরাণী বৈঠক ঘর হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া আসিলেন; আসিয়া নয়ন-তারাকে বলিলেন, "ও ঠাকুরঝি! ছি ছি! কি কদাকার! কি কদাকার! কি মাতলামিই কর্‌ছে, তোমাকে কি বল্‌বো; উনি বোঝেন না, আমি ত আর বৈঠকঘরে যাব না।" নয়ন-তারা রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন। ক্রমে নীচের ঘর হইতে নানাপ্রকার ধ্বনি আসিতে লাগিল। নয়ন-তারা জননীকে বলিলেন—"মা, বুঝি বা বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়!"

তৎপরদিন অতিথিরা চলিয়া গেলে, তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে মনের ঝাল ঝাড়িলেন;—দাদা! তোমাদের কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছি, বাড়ীটে কি শুঁড়ীর দোকান না তাড়ীখানা, যে কতকগুলো অসভ্য অভদ্র লোক জুটিয়ে গোলমাল কর্‌বে।

সুরেশ। নীচের ঘরে কে কি করে, তাতে তোরা কাণ দিস্ কেন?

নয়ন-তারা। বাবাই যেন চলে গিয়েছেন, মা ত এখনও আছেন, আমরা ত আছি, তোমাদের লজ্জা করে না, তোমাদের মা বোন যে বাড়ীতে আছে, সেখানে এ রকম বাঁদরামি কর্‌বার জন্যে লোক ডেকে আন!

নয়ন-তারা জীবনে বোধ হয় এত ক্রোধ কখনও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ক্রোধ দর্শনে সুরেশও ক্রুদ্ধ হইলেন।

সুরেশ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) That spiritual pride will ruin you,—অর্থ—এই অহঙ্কারেই তুই গোল্লায় যাবি।

নয়ন-তারা। অহঙ্কারের কথাটা কি হলো?

সুরেশ। (ক্রোধ-কর্কশ স্বরে) How do you dare use such expressions against a number of gentlemen!—কতকগুলি ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এমন ভাষা কিরূপে ব্যবহার করিস্।

নয়ন-তারা। gentlemen! gentlemen শব্দের অপমান! এরা যদি gentlemen হয়, তবে অসভ্য বর্ব্বর কে?

সুরেশ। (ক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) Shut up, I say! you are forgetting manners! You should teach yourself to speak more respectfully of other people—আমি বল্‌ছি চুপ কর্, তুই ভদ্র রীতি নীতি ভুলে যাচ্ছিস্,—অন্য লোকের বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধার সহিত কথা কইতে শেখা উচিত।

নয়ন-তারা। তুমি রাগই কর আর যাই কর, এ বাড়ীতে আমরা থাক্‌তে কখনই এ সব হতে পার্‌বে না।

সুরেশ। Oh I see, the house is yours; bid us go away, and we shall clear out at once—তাই ত বাড়ীটে যে তোদের; আচ্ছা, আমাদের যেতে বল্, আমরা এখনি চলে যাচ্ছি।

এই কথাতে নয়ন-তারা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দাদা! তুমি যখন মানুষের উপর নিষ্ঠুর হবে মনে কর, তখন আর মুখের দিকে তাকাও না, আমি কি তাই মনে করে বলেছি?

এই বলিয়া টেবলে হাত রাখিয়া হাতে মাথা দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভগিনীর চক্ষে জল দেখিয়াই সুরেশ নরম হইয়া গেলেন। উঠিয়া নয়ন-তারার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুই ত জানিস সকল সমাজেই পুরুষদের এবিষয়ে মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, আচ্ছা ভবিষ্যতে যাতে এরকমটা না হয় তা করা যাবে।"

ইহার পরে সুরেশ যোগেশের বিলাত ফেরত বন্ধুদের আসা কিছু দিন বন্ধ হইল। নয়ন-তারা ঘোর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এস্, পি, রায়ের পত্নীর নিকট হইতে এক ভয়ঙ্কর চিঠি আসিয়া উপস্থিত। চিঠিখানি অতি গোপনীয় ও নয়ন-তারার নামে। চিঠিখানা এই—

"ভাই! একটা দুঃখের সংবাদ দিতে যাচ্চি। তোমাকে না বলে আর কাকে বল্‌বো। যোগেশ ঠাকুর-পো বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। এমন কি আমরা নিজের লোক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ কর্‌ছি। সে দিন ঘোষেদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল; যোগেশ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল; খাবার সময় অতিরিক্ত মদ খেয়ে যে অসভ্যতাটা কর্‌লে, তা আর কি বল্‌বো, আমাদের পালাতে ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌লো। তারপর, যাবার সময় তাদের আমোদিনীকে অতি বিশ্রী ভাবে অপমান করেছে। সে আর বল্‌বার নয়, এতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ মেয়েতে মেয়েকে বল্‌তে পার্‌ছে না। কি বল্‌বো ভাই! সেই অবধি আমাদেরও তাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়েছে; লজ্জাতে আর মুখ দেখাতে পার্‌ছি না।

আর একটা কথা। সে দিন আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে যা কর্‌লে, তা দেখে আর তার সঙ্গে এমন জায়গায় যাবার ইচ্ছে নেই। আমাদের মানা না শুনে সেই বাজারের মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে, এমনি হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি কর্‌তে লাগ্‌ল, যে আমাদের গাড়ীতে আন্‌তে লজ্জা বোধ হতে লাগ্‌ল। গোবিন বাবুকে ভাল বল্‌তে হবে, তাঁকে ঐ মেয়ে মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচয় করে দেবার জন্তে এত টানাটানি কর্‌লে, তিনি কোন মতেই গেলেন না। শেষে আর একজনকে ধরে নিয়ে গেল। আমি বলে রাখ্‌ছি শোন, এই যোগেশের জন্তে গোবিন্‌বাবু আবার খারাপ হবে; সৌদামিনীর ঘরে আগুন লাগ্‌বে। এ চিঠী গোপন, অতি গোপন! দরকার হ'লে যোগেশকে দেখাতে পার।

তোমাদেরই
সুমতি।

এই চিঠী পাইয়া নয়ন-তারা বিপদ-সমুদ্র সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন পিতৃব্যকে ডাকাইয়া সমুদয় বলিবেন। আবার ভাবিলেন জ্যেষ্ঠকে পত্রখানি দেখাইবেন, যদি তাঁর চেতনা হয়। আবার ভাবিলেন সর্ব্বাগ্রে যোগেশকে গোপনে বলাই ভাল, হঠাৎ জানাজানিটা করা ভাল নয়। এই ভাবিয়া একদিন যোগেশকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ

করিয়া এস, পি, রায়ের পত্নীর পত্রখানি পড়িবার জন্য তাঁর হাতে দিলেন। দিতে তাঁর হাত কাঁপিতে লাগিল; চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

যোগেশ পত্রখানি লইয়া আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেন। পাঠান্তে লজ্জাতে অধোবদন হইয়া রহিলেন, আর মুখ তুলিতে পারিলেন না।

নয়ন-তারা। আমোদিনীর প্রতি কি অভদ্রতা করেছ?

যোগেশ। তোমাকে বল্‌তে লজ্জা কর্‌ছে।

নয়ন-তারা। সে কি! মেজদা অপরের বোনের প্রতি এমন ব্যবহার করেছ, যা নিজের বোনকে বল্‌তে লজ্জা কর্‌ছে! যাহোক গোপন করো না, আমাকে বল।

যোগেশ আবার অনেকক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিলেন।

নয়ন-তারা। বল আমার কাছে গোপন করো না।

যোগেশ। এমন কিছু করেছি যা তোমাকে বল্‌বার নয়।

আবার লজ্জাতে অধোবদন।

নয়ন-তারা বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগেশ কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া অবশেষে নয়ন-তারার পায়ের নিকট হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার হাত ধরিয়া "বোনদিদি! আর এমন হবে না।"

নয়ন-তারা। (অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া) তোমার বোনের প্রতি যদি কেউ সেরূপ ব্যবহার কর্‌তো তাহলে কি কর্‌তে?

যোগেশ। (মৌনী)।

নয়ন-তারা। বল কি কর্‌তে?

যোগেশ। তাকে লাথি মেরে বাড়ী হতে তাড়াতাম।

নয়ন-তারা। তারা তোমাকে লাথি মেরে তাড়িয়েছে?

যোগেশ। বাড়ীর লোকে তখন টের পায় নি, পরে শুনেছে।

নয়ন-তারা। আমোদিনী কি কর্‌লে।

যোগেশ। আপনাকে বড়ই অপমানিত বোধ কর্‌লে?

নয়ন-তারা। তুমি কি ভাবছ, কি কর্‌বে?

যোগেশ। আমি তার পর দিনেই মাপ চেয়ে আমোদিনীকে ও তার দাদাকে পত্র লিখেছি।

নয়ন-তারা। তবু ভাল, কোনও জবাব পেয়েছ ?

যোগেশ। হাঁ পেয়েছি।

এই বলিয়া কোটের পকেট হইতে একখানি চিঠী বাহির করিয়া ভগিনীর হস্তে দিলেন। সেখানি আমোদিনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জি, ঘোষের লিখিত। পত্রখানি এই ;—

Sir,

Your letter received. Please let this be your last letter to us ; and also henceforth no longer consider us your friends.

অর্থ—মহাশয় ! আপনার পত্র পাইয়াছি, এই যেন আপনার শেষ পত্র হয়, অতঃপর আমাদিগকে আর বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন না।

নয়ন-তারা। যাঃ ! তোমার ব্যবহারে দুটো পরিবারের এত দিনের বন্ধুতাটা ভেঙ্গে গেল। ভাগ্যে বাবা নাই, থাক্‌লে তিনি অপমানে মরে যেতেন। যারা আপনার লোকের মত, তাদের মেয়ের প্রতি তুমি কি করে এমন ব্যবহার কর্‌লে ?

যোগেশ। নেশার ঝোঁকে করেছি।

নয়ন-তারা। তারপর থিয়েটারের ব্যাপারটা কি ? বাজারের কতকগুলো মেয়ে কি তোমার ইয়ারকী দেবার লোক, তুমি কি করে তাদের সঙ্গে মাখামাখি কর্‌তে গেলে। তখন আমাদের কথা মনে হলো না ?

যোগেশ। বোন দিদি ! সেটাও নেশার ঝোঁকে করেছি।

নয়ন-তারা। তুমি যে হাতে তাদের ধরেছ, তাদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করেছ, সেই হাত আমার গায়ে দিচ্চ, মনে হয়ে কেমন লজ্জা কর্‌ছে।

যোগেশ তাড়াতাড়ি হাতখানি সরাইয়া লইলেন।

ইহাতে নয়ন-তারা কাঁদিয়া ফেলিলেন, “মেজদা মেজদা ! একি হলো, তুমি কি এমনি অধম হ’য়েছ যে, নিজের বোনকে ছুঁতে লজ্জা পাচ্চো।”

যোগেশ। আমি বল্‌ছি আর এমন হবে না।

নয়ন-তারা। ভদ্রলোকের ছেলেরা যেথানে বাজারের মেয়েদের সঙ্গে কোমর দুলয়ে নাচে ভদ্রলোকের সেথানে যাওয়াই উচিত নয়। আমাদের

বাড়ীর কারুকে কখনও যেতে দেখেছ? বাবা যাওয়ার বড় বিরোধী ছিলেন। তিনি থিয়েটার দেখার বিরোধী ছিলেন না। ইংরাজদের থিয়েটারে আমরা গিছি। এসব থিয়েটারে যেতে দিতেন না। কেবল গিয়েছ তা নয় সেই সব মেয়ে মানুষের সঙ্গে মাখামাখি করেছ, আমি ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি না কিরূপে তোমার এত অধোগতি হলো।

বলিয়া নয়ন-তারা বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

যোগেশ। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আর মদ খাবো না ও থিয়েটারে আর যাব না। তুমি এ সব কথা আর কারুকে বলো না।

এই প্রতিজ্ঞার পর বাস্তবিক যোগেশ আপনার স্বভাব চরিত্র শুধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সুরাপান ও থিয়েটারে যাওয়া দুই পরিত্যাগ করিলেন। কেবল নয়ন-তারার চক্ষের জলেই যে ও পরিবর্ত্তনটা আসিল তাহা নহে, আমোদিনীর প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও যে জন্য ঘোষদের সঙ্গে বন্ধুতাটা ঘুচিল, তাহা স্মরণ করিয়া সত্য সত্যই লজ্জিত হইয়াছিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জিনিসে এতটা আত্ম-বিস্মৃত করে সে জিনিস আর পান করিবেন না।

যোগেশ সুরাপান ত্যাগ করিলেন দেখিয়া, সুরেশ ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, "গোঁড়াদের খাতায় নাম লেখালি নাকি?" যোগেশ নিরুত্তর থাকেন, কিছুই বলেন না; নয়ন-তারাও কিছু বলেন না।

কিছুদিন পরে সুরেশচন্দ্র আবার তাঁহার কয়েক জন বিলাত ফেরত বন্ধুকে এক শনিবার নিমন্ত্রণ করিলেন।

নয়ন-তারা ভাবিলেন, "দাদার সঙ্গে সেবারে ঝগড়াটা হয়ে আছে, এবার তাঁর বন্ধুদের একটু আতিথ্য করি" এই ভাবিয়া আহারের স্থানে গেলেন। গিয়া তাঁহাদের সহিত আহারে ও আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সুরেশের আদেশ ক্রমে আহারের স্থানেই মদ আসিল। পিতার প্রতিষ্ঠিত পুরাতন নিয়মটা ভাঙ্গা হইতেছে, দেখিয়া তাঁহার আর বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতে লাগিল, কিন্তু কি করেন, তখন পলায়ন করাটা ভাল দেখায় না, কোনও প্রকারে বসিয়া থাকিলেন, ভাবিলেন পরে জ্যেষ্ঠের সহিত ঝগড়া করিবেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অতিথিদের একজনের

ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথা ঝুলিয়া পড়িল ও অপর একজনের কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি আর থাকা উচিত বোধ করিলেন না, টুনী ও পটলাকে ইসারা করিয়া নিজে পলাইয়া আসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নন্দরাণী পলাইয়া আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি! তাঁরা ঠাকুরপোকে মদ খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন।"

নয়ন-তারা। দাদা দেখুন কি সব জানোয়ার ডেকে আনেন।

সুরেশচন্দ্র নিজেই বুঝিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় যাইতেছে; অমনি উঠিয়া যোগেশকে পীড়াপীড়ি করা বারণ করিয়া দিলেন এবং খানসামাকে ইসারা করিয়া সুরা যোগান বন্ধ করিয়া দিলেন; বন্ধুদিগকে ধরিয়া বৈঠকঘরে লইয়া গেলেন।

বৈঠকের আসর আর হবে কি! সুরেশচন্দ্র বন্ধুদিগকে স্বীয় স্বীয় শয্যাতে দিয়া, সুরার আলমারির চাবিটী নিজে লইয়া উপরে শয়ন করিতে গেলেন; যোগেশ অতিথিদিগের অবশিষ্ট পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত রহিলেন।

সুরেশ গিয়া শয়ন করিলেন, ওদিকে অতিথিগুলি আবার যোগেশকে সুরার জন্য ধরিল। যোগেশ প্রথমে "দাদা চাবি নিয়ে গেছেন" বলিয়া সে অনুরোধ কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া, নিজের একটী চাবি দিয়া আলমারিটী খুলিয়া আবার সুরা যোগাইলেন। সেবারে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িল না। তিনি নয়ন-তারার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আর রক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শেষে অতি বীভৎস কাণ্ড দাঁড়াইল। কেহ শিয়াল ডাকে, কেহ কুকুর ডাকে, কেহ অন্য জানোয়ারের ডাক ডাকে, কেহ অট্টহাস্য করে! উপরে যাঁহারা শয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিদ্রা হইবার যো নাই।

নয়ন-তারা জননীকে বলিলেন, "দেখছ মা কি কাণ্ড? আর এখানে থাকা চল্‌লো না। চল আমরা এখান হতে চলে যাই, তাতে যদি ওদের চেতনা হয়।" সুরেশ শুইয়াছিলেন, এই কোলাহলে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। তখন কি আর থামান যায়! একজন কোচখানির উপরে পড়িয়া আছে, ঘুমাইতেছে কি বেহুঁশ হইয়া আছে বুঝা যায় না; দুই

জন, হাসিয়া ও করতালি দিয়া গান ধরিয়া নাচিতেছে; অপর একজন অভদ্র ভাষাতে গালাগালি দিয়া তাহাদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেশ ভয়ে ভয়ে অধিক পান করিতে পারেন নাই; তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া স্বীয় স্বীয় শয্যায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সংস্কৃত কবি উপস্থিত থাকিলে হয়ত বলিতেন, দেখ আমার উক্তির প্রমাণ এখানে;—

"উত্তম-প্রকৃতিঃ শেতে মধ্যো হসতি গায়তি।
অধম-প্রকৃতিশ্চাপি পরুষং বক্তি রোদিতি॥

সুরাপান করিলে উত্তম-প্রকৃতির লোকে নিদ্রা যায়, মধ্যম-প্রকৃতির লোকে হাসে গান করে, আর অধম-প্রকৃতির লোকে গালাগালি দেয় ও কাঁদে।

সুরেশ যোগেশকে আলমারি খোলার জন্য অনেক তিরস্কার করিয়া অতিথিদিগকে বুঝাইয়া ধরিয়া শয়ন করাইলেন, করাইয়া উপরে আসিলেন।

পরদিন প্রাতে অতিথিগুলি লজ্জাতে আর মুখ দেখাইতে পারিল না, প্রাতে উঠিয়াই চলিয়া গেল।

সুরেশ প্রাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিলেন, যে আর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না; সে ভবনে আর অতিথিদিগকে সুরাপান করিতে দিবেন না; এবিষয়ে তিনি যে একটু অসংযত হইয়া পড়িতেছেন তাহা সুধরাইয়া লইবেন; পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনার জন্য নয়ন-তারার নিকট আহারের সময় ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন ও তাঁহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা জানাইবেন। কিন্তু সেদিন প্রাতে নয়ন-তারা আহারের স্থানে আসিলেন না। তাঁহার মনটা বড়ই খারাপ আছে। দুপর বেলা সুরেশ একবার ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন মুখ ভার, তাঁহাকে দেখিয়াও কথা কহিলেন না, অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

ভগিনীর এতটা বিরাগ দর্শনে সুরেশেরও মনে বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। সমস্ত দিনের মধ্যে নয়ন-তারা আপনার ঘর হইতে বাহির হইলেন না, শয্যাতে পড়িয়া কেবল "কি করি, কি করি," এই চিন্তাতে যাপন করিলেন। অপরাহ্ণে হরেন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া নয়ন-তারার চিত্তের অনেকটা বিনোদন হইল। বাঙ্গালা

সাহিত্য বিষয়ে দুজনে অনেক আলোচনা হইল, যাহাতে তিনি মনের কষ্টের কারণটা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেলেন। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি কালের আহারের সময় উপস্থিত। নয়ন-তারা নন্দরাণীর মুখে শুনিয়াছেন পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনার জন্য জ্যেষ্ঠ দুঃখিত এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে আহারের স্থানে আর সুরা আনিবেন না। ইহা শুনিয়া বলিয়াছেন, যে আহারের স্থানে যাইবেন। হরেন্দ্রের সহিত নামিয়া যাইতে যাইতে সিঁড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে সুরেশ ও নন্দরাণীর কথোপকথন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা নয়ন-তারার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যোগেশ মনের দুঃখে আহারের স্থানে আসেন নাই।

সুরেশ। কোথা থেকে যে একটা পাপ যুটেছে, আমাদের ভাইবোনের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

নন্দরাণী। ছি! ছি! তুমি হরেনবাবুর প্রতি অন্যায় করছো। তিনি এসব কথার ভিতরে থাকেন না।

সুরেশ। সেইত নয়ন-তারার মন্ত্রদাতা গুরু।

নন্দরাণী। তোমার ঐ একটা বড় দোষ, মনের ভিতর একটা কথা ঢুক্‌লে আর বার্ কর্‌তে পার না।

সুরেশ। বাবাকে দু'শবার বলেছি, ওকে ছাড়িয়ে দিন, তখন দিলেন না, এখন কি ও নয়ন-তারাকে ছাড়বে? এখন জান্‌তে পেরেছে, যে নয়ন-তারা মাসে দেড়শ টাকা ও এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছে; তারপর মাকে বাবা যে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন এবং মার নিজের যে পঁচিশ হাজার টাকা আছে, সে পঞ্চাশ হাজারের সবটা না হোক, বেশি ভাগটাও নয়ন-তারা পাবে। এখন ও কেঁটের মত নয়ন-তারার গায়ে লেগে থাক্‌বে।

নন্দরাণী। (বিরক্তির সহিত) ছিঃ হরেনবাবুকে এমন কথা বল্‌লে পাপ হয়; তাঁকে তুমি চেন না; তাঁর মন এমন নীচ নয়; তিনি খুব বড় মনের লোক। তিনি যে ঠাকুরঝীকে ভালবাসেন সে কি টাকার জন্যে না ঠাকুরঝীর গুণে?

সুরেশ। টাকার কথাটাও ভিতর ভিতর আছে।

নন্দরাণী। (বিরক্ত হইয়া) যাও, তুমি মানুষকে বড় ছোট চোকে দেখ।

সুরেশ। আচ্ছা আমি বলে রাখছি দেখো ও এখন নয়ন-তারাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে আদা জল খেয়ে লাগবে। হাজার হোক রাঁধুনী বামনীর ছেলে, মাসে দেড়শ টাকা ও পঞ্চাশ হাজার নগদ, সেটা বড় কম কথা নয়।

নন্দরাণী। (বিরক্ত ভাবে) তোমরা কেবল টাকাই চিনেছ বৈত নয়, সাধু লোকের মর্য্যাদা কি বুঝবে ?

সুরেশ। সাধে তোমাকে গোঁড়াদের দলে নাম লেখাতে বলি।

এই কথোপকথন হরেন্দ্রের কর্ণে গেল। তিনি চলিয়া গেলে নয়ন-তারার মন এত খারাপ হইয়া গেল, যে আহারের স্থানে আর যাইতে পারিলেন না। 'যাঃ সর্ব্বনাশ হলো' বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার দিলেন।

সুরেশ যখন শুনিলেন নয়ন-তারা ঘরে দ্বার দিয়া আছেন, তখন অতিশয় বিরক্ত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন হরেন্দ্র কাণে কি মন্ত্র দিয়া গেল, যা একটু ভাল ভাব হইয়াছিল, তাও নষ্ট হইল। এই ভাবিয়া বিষণ্ণ ও বিরক্ত অন্তরে আহার করিয়া উপরে গেলেন।

পরদিন প্রাতে নয়ন-তারা মনের ক্লেশে আহারের স্থানে আসিলেন না ; তাহাতে সুরেশ আরও বিরক্ত হইয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন, Surely, this is carrying things to extreme—এত দেখি বেজায়, এত বাড়াবাড়ি কেন।

এদিকে পূর্ব্ব দিনের কথাগুলি হরেন্দ্রের আত্ম-মর্য্যাদার উপরে জ্বলন্ত গোলার ন্যায় পড়িয়াছে! তিনি শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "তাইত ধনীদের সঙ্গে গরীবদের বন্ধুতা হতে গেলেই কথাটা এইরূপ দাঁড়ায় বটে। দূর হোক বন্ধুতা এখানেই ভাঙ্গুক ; আর আমি সে দ্বারে যাব না। তবে কি নয়ন-তারার মুখ এজন্মে আর দেখব না ?" অমনি চক্ষে জল আসিল, বালিশে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। "নয়ন-তারার মুখ এজন্মে আর দেখব না ? সে বেচারির অপরাধ কি ? ধনী বলে অহঙ্কার তাঁরত নাই ; আমার বন্ধুতার প্রতি অবজ্ঞা তাঁরত নাই ; না না সে নির্ম্মল মনে সন্দেহের রেখাও নাই ; তবে কেন আমি তাঁকে পরিত্যাগ করি ? না আমি তা পারব না ; আমি নয়ন-তারাকে পরিত্যাগ করলে

বাঁচব না। কিন্তু সে বাড়ীতে আমি আর কিরূপে যাব? যারা আমাকে এত নীচ চক্ষে দেখে, আমার বন্ধুতাকে নীচ স্বার্থপ্রণোদিত মনে করে, আমি কি করে সে বাড়ীতে বন্ধুতা করতে যাব? অনিচ্ছাতেওত নয়ন-তারাকে ত্যাগ করতে হচ্চে। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করলাম নিজ আয়ে তাঁকে সুখে রাখবার আয়োজন না করে, আর তাঁকে মুখ দেখাব না। সুরেশবাবু দেখুন একজন গরীব বামনের ছেলের হাড়ে, একজন রাঁধুনী বামনীর ছেলের হাড়ে কত হয়। জগদীশ্বর দিন দেবেন, এ প্রেম-অগ্নি ততদিন হৃদয়ে ধারণ করব, ততদিন তপস্যাতে থাকব, ততদিন নয়ন-তারার মুখ দেখব না। আমি জানি তিনিও এ প্রেমাগ্নি হৃদয়ে ধারণ করবেন। সে মহৎ প্রকৃতি বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। তবে আর নয়; রায় মহাশয়ের ভবনে আর পদার্পণ নয়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, এপাশ ওপাশ করিতে করিতে, রাত্রি পোহাইয়া গেল। ভোরে উঠিয়া নয়ন-তারাকে এক পত্র লিখিলেন। পত্রখানি লিখিতে চক্ষের জল পড়িয়া অক্ষরগুলি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এ বলবান সবলচেতা যুবক এত ক্রন্দন কখনও করে নাই। পিতৃশোক পাষাণের ন্যায় সহিয়াছে, ঘোর দারিদ্র্য যন্ত্রণা বজ্রের ন্যায় অপরাজিত চিত্তে বহিয়াছে, অপরের ঘৃণা অবজ্ঞার সহিত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, অসহ্য রোগ যন্ত্রণা মুখ মুদিয়া সহিয়াছে, একটী বার মুখ বাঁকায় নাই, আজ কেন নয়ন-তারাকে ছাড়িতে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে? আজ কেন হৃদয় ভাঙ্গিয়া, পিষিয়া, দলিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে! প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুমিই ইহার উত্তর দেও।

চিঠীখানি খামে পূরিয়া শিরোনামাটী লিখিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, চিঠীখানা লিখিয়া বিদায় না লইয়া একবার দেখাটা করিয়া জন্মের মত বিদায় লই। হায়রে প্রেমিকের আত্ম-প্রতারিত হৃদয়! তুমি মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে পার, আবার মুহূর্ত্তে গড়িতেও পার! মন বলিল—তাই ভাল। "কলেজে প্রথম ঘণ্টাতে কাজ নাই, সেই সময়ে গিয়ে দেখা করে বিদায় নিয়ে আসব। সাক্ষাতে দশ মিনিটে যত কথা হয়, চিঠীতে দুই ঘণ্টাতে তা হয় না।" এই ভাবিয়া চিঠীখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

স্কুল হইতে প্রথম ঘণ্টা ছুটী লইয়া হরেন্দ্র নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি রায় মহাশয়ের ভবনের সন্নিহিত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, যে সুরেশ গাড়ী করিয়া কলেজে যাইবার জন্য গেট দিয়া বাহির হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সুরেশ জ্বলিয়া গেলেন এবং চীৎকার করিয়া, হরেন্দ্রকে শুনাইয়া, দ্বারবানকে বলিলেন,—"দরওয়ান হরেনবাবুকো মাত ছোড়ো, বোলো ভিতর জানেকা হুকুম নেহি।" আর কোথায় যায়! হরেন্দ্রের পায়ের রক্ত মাথায় উঠিয়া গেল! ক্ষণকালের জন্য চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; রাস্তার ধারের আলোর খুঁটিটা ধরিতে হইল! ধরিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন;—"কেন দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ দেখা করতে এলাম, গাল বাড়িয়ে চড়টা খেলাম, চিঠীখানা পাঠালেই হত।"

তাঁহার প্রকৃতির কথা অগ্রেই বলিয়াছি, এই ঘোর আন্দোলনের মধ্যে হঠাৎ এক আশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য্য দৃঢ়তা তাঁহার প্রাণে আসিল। বাসাতে পৌছিতে না পৌছিতে মন নয়ন-তারাকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। গিয়াই দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। সে পত্রখানি এই :—

"গত কল্য সুরেশ বাবুর একটী কথা শুনিয়া বড় মানসিক ক্লেশে রাত কাটাইয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি আমার ন্যায় গরীব লোকের পক্ষে আপনাদের বন্ধুতার প্রার্থী হওয়া উচিত হয় নাই। তাই আজ প্রাতে আপনার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। লিখিয়া ভাবিলাম, নিজে সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লওয়া ভাল। তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দ্বারের নিকটে দেখিয়াই সুরেশ বাবু দ্বারবানকে আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দিতে হুকুম দিলেন। আমি যে বুঝিয়াও বুঝিলাম না, তাহার ফল এই হইল। সামান্য পথ-ভিখারীর ন্যায় অপমানিত হইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে; এখন আপনার নিকট বিদায় লইতেছি। যদি কখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপযুক্ত হই, তবে সাক্ষাৎ করিব। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; এ দুই বৎসরে যাহা কিছু দেখিয়াছি ও পাইয়াছি তাহার স্মৃতি অন্তরে রহিল।"

এই পত্র খানি পাইয়া নয়ন-তারার কি অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়! তিনি যে কোথায় আছেন তাহা যেন বুঝিতে পারেন না। জাহাজ ভাঙ্গিয়া যে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সে যে একখানি কাষ্ঠ হাতের কাছে পাইয়া ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, সেখানি যদি তরঙ্গের আঘাতে হাত হইতে সরিয়া যায়, তবে তাহার দশা যেরূপ হয়, নয়ন-তারার যেন সেই দশা হইল। পিতা চলিয়া গিয়াছেন; ভ্রাতাদের সঙ্গে মিল নাই; পৃথিবীতে যে একজন পুরুষ মনের মত পাইয়াছেন, যাঁহার প্রেমে আস্থা স্থাপন করিয়া এত বড় শোকটা সহিয়াছেন, তিনিও দূরে গেলেন; আজ আপনাকে বড়ই একাকী বোধ হইতে লাগিল। পড়িয়া পড়িয়া ভয়ানক কাঁদিলেন। পত্রখানি আবার পড়িলেন। সামান্য পথ-ভিখারীর ন্যায় অপমানিত হইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।”—এই কথাগুলি পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্রকে লিখিলেন—

“আপনার পত্র পাইয়া সমুদয় অবগত হইলাম। আমাদিগকে যে ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। আমরা কোনও প্রকারে আপনার বন্ধুতার উপযুক্ত নই। জগদীশ্বর আপনাকে মহত্বের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; আপনার পথ কেহ অবরোধ করিতে পারিবে না। আপনি যেথানেই থাকুন, আপনার উন্নতি দেখিয়া আমি সুখী হইব। আমিও আপনার নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি। তবে এই মাত্র দুঃখ রহিল, যদি এ অসার প্রেমের দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ না করিতাম তাহা হইলে এই অপমানটা সহ্য করিতে হইত না। আমিও এ বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম; আপনার প্রতি যে অপরাধ হইয়াছে তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে এ বাড়ীতে পদার্পণ করিব না। আমার কথা আর স্মরণ রাখিবেন না।”

পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া নয়ন-তারা সমস্ত দিন দ্বার দিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিলেন; উঠিলেন না; আহার করিলেন না; সংসারের কাজ দেখিলেন না; কিছুই করিলেন না। কেহই তাঁহার দ্বারে ডাকিতে সাহস করিল না। জননী তনয়াকে সমস্ত দিন এইভাবে যাপন করিতে দেখিয়া ঘোর বিপদ গণনা করিয়া দিবাশেষে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার শোক নবীভূত হইয়া উঠিল। তখন নয়ন-তারা দ্বার খুলিয়া জননীর নিকট গেলেন; মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া

গেল; সন্ধ্যার সময় জননীর মনস্তুষ্টির জন্য কিছু আহার করিলেন। সন্ধ্যার পরেই তিনি জননীকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"দেখ মা তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু আমি আর কোন মতেই এ বাড়ীতে থাকৃতে পারছি না; আমি চলে যাই; তোমার এখন যাওয়া হবে না; বাড়ীটা বাবা তোমাকে দিয়ে গিয়েছেন; আমরা দুজনে গেলে, দাদারা চলে যাবেন, সেটা ভাল হবে না। তুমি এখানেই থাক, আমি কাকার বাড়ীতে থাক্‌ব, তোমাকে সর্ব্বদা নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে দু চারদিন থেকে আস্‌বে। আমি চলে গেলে আর তুমি থাক্‌লে ওদের বাড়াবাড়িটা একটু কম্‌তে পারে।" জননী কোন প্রকারেই তাঁহাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নন। "তুই গেলে কি আমি বাঁদরগুলোকে নিয়ে থাক্‌ব?"

নয়ন-তারা। না মা, তুমি বুঝছ না, তুমি গেলে চল্‌বে না। আমাকে ত সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাবে। আর আমি গেলে দেখো, দাদার মনে কষ্ট হবে, হাজার হোক্ ভালবাসাটা কোথায় যাবে; আমাকে ফিরিয়ে না এনে দাদা সুস্থির থাক্‌তে পার্‌বেন না; তিনি গিয়ে হরেন বাবুর কাছে মাপ চাবেন, তা হ'লেই আমি আবার আস্‌বো।

এইরূপে জননীকে গড়িতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সে রাত্রি তিনি জননীর কাছেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতে বিনোদ আসিয়া উপস্থিত। নয়ন-তারা পূর্ব্বদিন বৈকালে পিতৃব্যকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া বিনোদকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। সকালে উঠিয়াই নয়ন-তারা নন্দরাণীর দ্বারা জ্যেষ্ঠকে জানাইয়াছেন যে, তিনি পিতৃব্যের ভবনে চলিয়া যাইবেন, হরেন্দ্রের অপমানের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে আর এ ভবনে পদার্পণ করিবেন না। শুনিয়া সুরেশ নিজ কার্য্যের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলেন; একবার ভাবিলেন হরেন্দ্রকে পত্র লিখিয়া মাপ চাহিবেন ও আসিতে বলিবেন, কিন্তু আবার অহঙ্কার ও অভিমান আসিয়া বাধা দিল।

এদিকে নয়ন-তারার জিনিস পত্র বাঁধা হইতে লাগিল। তিনি পিতৃব্যের ভবনে গিয়া আহার করিবেন, সেজন্য যাইবার ত্বরা বাড়িয়া গেল। ক্রমে তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জননী আর নিজের গৃহ হইতে বাহির

হইলেন না ; সেখানে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নন্দরাণী, টুনী পটলা চাকর, চাকরাণী সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল।

নয়ন-তারা নন্দরাণীকে বলিলেন—"ভাই! দাদাকে গিয়ে বল, আমি চল্লাম।" এই সংবাদ পাইয়া সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুরেশ। তুই কেন যাবি আমরাই চলে যাচ্ছি, এ বাড়ী ত তোর।

নয়ন-তারা। (অগ্নিপ্রায় হইয়া) কি দাদা! এখনও এমন কথা বলো? এ বাড়ী আমার হ'লে যাঁর পায়ের ধূলো নেবার লোকও তোমরা নও, তাঁকে পথের কুকুরের মত দোর থেকে তাড়িয়ে দিতে পার?

এই বলিয়া মনের আবেগে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া একটা পুটুলির উপর বসিয়া পড়িলেন ও হাতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিলেন ; স্থির, ধীর, গম্ভীর, যেন পাষাণের প্রতিমা! আর একটীও কথা কহিলেন না ; আস্তে আস্তে নন্দরাণী, টুনী, পটলা, চপলা, মিনী প্রভৃতি সকলকে চুম্বন করিয়া ও জননীর ঘরে গিয়া তাঁর পদধূলি লইয়া, বিনোদের সঙ্গে নীচে নামিয়া গেলেন। যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন তখন একজন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড কাগজ দিল। ঐ কাগজে যোগেশের হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত আছে—sister! don't leave us, we shall grow worse"—অর্থাৎ ভগিনি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আমরা আরও খারাপ হইয়া যাইব।" যোগেশ শনিবারের ঘটনার পর দুই দিন নয়ন-তারাকে মুখ দেখান নাই ; মনের দুঃখে ও অনুতাপে লুকাইয়া আছেন। এখন নয়ন-তারা চলিয়া যান শুনিয়া ঐ কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

এই কথাগুলি নয়ন-তারার হৃদয়ে আঘাত করিল। যোগেশের উপরে তাঁহার একটা প্রভাব আছে, যাহা সুরেশের উপরে নাই, তাহা তিনি জানেন। সুতরাং এই অনুরোধ পত্র পাইয়া একটু দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—"এখন আর ভাবিবার সময় নাই।" তৎপরে গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। দাস দাসীরা বলিল—"যাঃ বাড়ীর লক্ষ্মী ছেড়ে গেল।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নয়ন-তারা চলিয়া গেলেই সুরেশ গভীর বিষাদে পতিত হইলেন। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে হরেন্দ্রকে অপমান করিয়া, তিনি মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। সে দুঃখ প্রকাশ করিবার অবসর পাইলেন না; অনিষ্ট ফল যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। তদবধি সুরেশ অতি ম্লান ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর লোকে আর তাঁহাকে হাসিতে দেখে না; কলেজ হইতে আসিয়া আর ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া খেলা করেন না; আর সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে যান না; এমন কি স্ত্রী পুত্র নিকটে আসিলে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন না; অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া যে সময়টুকু পান, পড়িয়া পড়িয়া কেবল পাঠ করেন। নন্দরাণী এই ম্লানতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "বিশেষ কিছু নয়।"

নয়ন-তারার যাওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি কলেজের বেতন পাইলেন। পাইয়াই ভগিনীর জন্য তিন মাসের দেয় ৭৫৲ টাকা কলিকাতায় পিতৃব্যের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। টাকা ফিরিয়া আসিল, নয়ন-তারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই সংবাদে সুরেশের চক্ষে জল পড়িল। তিনি সে টাকা স্বীয় বাক্সে তুলিলেন না; ব্যাঙ্কে ভগিনীর নামে জমা দিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন না ভগিনী ঘরে ফিরিয়া আসে, মাসে মাসে ২৫৲ টাকা তাহার নামে জমা হইবে। যদিও জানিতেন পিতার প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি পাওয়ার পর ভগিনীর অর্থের অপ্রতুল নাই, তথাপি এ ২৫৲ টাকা তাঁহার এমনি পবিত্র বোধ হইতে লাগিল, যে তাহা স্পর্শ করিবার প্রবৃত্তি হইল না।

ওদিকে হরেন্দ্রেরও চুঁচড়াতে থাকা ভার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যত সহজে আত্ম-সম্বরণ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা পারিতেছেন না। মনকে নয়ন-তারা হইতে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়াতে প্রাণের মধ্যে এমন একপ্রকার শূন্যতা আসিয়াছে, যে তাহা আর সহ্য হইতেছে না, শরীর ও মন দুই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দুইটী বিষয় তাঁহার বিষ বোধ হইতেছে। প্রথম—নয়ন-তারাহীন চুঁচড়া বিষ বোধ হইতেছে। যে চুঁচড়া তাঁহার এত

প্রিয় স্থান, যেখানে তাঁহার স্পোর্টিং ক্লব, তাঁহার ড্রিলিং ব্যাণ্ড প্রভৃতি আছে, যেখানে তাঁহাকে ভালবাসিবার, শ্রদ্ধা করিবার, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার এত লোক আছে, সেই চুঁচড়াও আজি তাঁহার চক্ষে আকর্ষণহীন হইয়াছে! তাঁহার মনটা যেন কোথায় যাই, কোথায় যাই করিতেছে। এক একবার ভুলিয়া ভুলিয়া পা দুখানা রায় মহাশয়ের ভবনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যায়, আবার তিনি চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসেন। এইরূপ ক্লেশে দিন কাটিতেছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টী বিষ বোধ হইতেছে, তাহা এই;—রায় মহাশয় গুপ্তিপাড়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যে দুই হাজার কয়েক শত টাকা ঋণস্বরূপ দিয়াছিলেন, সেই দুই হাজার টাকা ঋণ বিষ সমান লাগিতেছে। কিন্তু টাকা পান কোথা? এই কারণে তিনি দারুণ মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন।

এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, যে কলিকাতার কোনও প্রাইভেট কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ শূন্য আছে, বেতন ১৫০৲ দেড়শত টাকা। ভাবিলেন ঈশ্বর-কৃপায় বুঝিবা আমার নিষ্কৃতি লাভের উপায় আসিল। বাস্তবিক তাহাই! আবেদন করিবামাত্র তিনি ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন।

হরেন্দ্র চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া চুঁচড়ার যুবকমহলে মহা বিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার দলের লোকেরা একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। তিনি যথাসাধ্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা কাজগুলো কোনও প্রকারে রক্ষা কর, আমি কল্‌কেতায় গেলেও সর্ব্বদা চুঁচড়াতে আস্‌বো ও তোমাদের সাহায্য কর্‌বো।"

যাইবার দিনে যুবকদিগের এক মহা সভা হইল; সেই সভাতে তাঁহাকে বিদায়সূচক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইল এবং স্থির হইল, যে তাঁহার একখানি ছবি পবলিক লাইব্রেরিতে থাকিবে।

ইহার পরে হরেন্দ্র কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার নূতন কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ও কাহারও নিকট হইতে দুই হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া সুরেশকে দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নয়ন-তারা পিতৃব্যের আলয়ে আসিলে পরিবার পরিজন সকলের আনন্দের সীমা থাকিল না। খুড়ীমা সমুদয় সংসারটা যেন তাঁহার হাতে

ছাড়িয়া দিলেন ; উঠিতে বসিতে নয়ন-তারার পরামর্শ চাই। ভাই ভগিনীরা পায়ে পায়ে ঘোরে, মুখ ফুটিয়া আদেশ করিতে বিলম্ব সয় না, আকার ইঙ্গিতে তাঁহার ইচ্ছা একটু বুঝিতে পারিলেই হয়, অমনি একজনের স্থানে পাঁচ জন ছুটিয়া যায়। খুড়া মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন ; উদ্দেশে অনেক গালাগালি করিলেন ; বলিলেন, "হরেনের অপরাধ কি, যে তাকে শেয়াল কুকুরটার মত দোর থেকে তাড়ায়! সে কি মানুষ নয়? হতভাগারা তার একটা কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য নয় ; অথচ অহঙ্কারটী পূর্ণ মাত্রায় আছে ; আচ্ছা আমি হরেনকে ডাকাচ্চি, সে আমার বাড়ীতে আস্‌বে।" নয়ন-তারা বলিলেন, "না কাকা! তা করো না, সেটা বড় খারাপ দেখাবে ; যেন আমি নিজের সুখের জন্যেই ভাইদের ছেড়ে এসেছি ; তারপর তিনি এখন আমাদের ছেড়ে দিয়ে সমুদয় মন প্রাণ দিয়ে নিজের উন্নতি সাধনে লেগেছেন, এখন আর টানাটানি করা ভাল নয়।"

নয়ন-তারা দুই দিন পরেই জননীকে আনাইলেন ; এবং প্রাণ মন দিয়া জননীর সান্ত্বনা ও শুশ্রূষাতে নিযুক্ত হইলেন। নয়ন-তারার শুশ্রূষার গুণে এবং কনিষ্ঠ রায় ও তাঁহার পত্নীর আদর যত্নে রায়-গৃহিণীর প্রাণে নয়ন-তারার বিচ্ছেদজনিত যে কিছু ক্লেশ হইয়াছিল, সমুদয় দূর হইল।

এই সময়ে নয়ন-তারার কর্ণগোচর হইল, যে হরেন্দ্র সুরেশকে দিবার জন্য দুই হাজার টাকা কর্জ্জ করিবার চেষ্টায় আছেন, এবং আপনার একজন বাল্য-সুহৃদ্ উকীলবাবুকে ধরিয়াছেন। ঐ উকীলবাবুটী কয়েকবার হরেন্দ্রের সহিত চুঁচড়ার বাড়ীতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নয়ন-তারা জননীর সহিত গোপনে একটা পরামর্শ স্থির করিয়া বিনোদের দ্বারা উক্ত উকীলবাবুকে পিতৃব্যের ভবনে ডাকাইলেন। উকীল বাবুর সহিত যে কথোপকথন হইল তাহা এই :—

জননী। আমরা আপনাকে একটু কাজের জন্য ডেকেছি, অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

উকীলবাবু। কি কাজ আজ্ঞে করুন, কাজের জন্যে আমাকে ডেকেছেন সে ত আমার সৌভাগ্য, এর আবার মার্জ্জনা কি?

জননী। শুন্‌লাম হরেন নাকি দু হাজার টাকা ধার কর্‌বার জন্যে বেড়াচ্ছে।

উকীলবাবু। আমার কাছে ত চেয়েছে।

জননী। আপনি কি বলেছেন?

উকীলবাবু। আমি বলেছি, আর কিছুদিন পরে হলে দিতে পারি, এখনি টাকাটা আমার কাছে নাই। কিন্তু তার টাকাটার এখনি দরকার।

জননী। আপনাকে কৌশলে একটা কাজ কর্‌তে হবে। আমি আপনাকে দু হাজার টাকা দিচ্চি। আমরা যে দিয়েছি, তা প্রকাশ করা হবে না। তা হলে হরেন নেবে না। সে আমার বড় ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়েছে। আপনি এইমাত্র বল্‌বেন, "কোনও আত্মীয় লোকের কাছ থেকে নিয়ে দিলাম, সময়ে শোধ করো।" তা বল্‌লে কি নেবে না?

উকীলবাবু। কেন নেবে না, তাতে তার আপত্তি কি হতে পারে? আমার হাতে এখন টাকা নাই, আমি যোগাড় করে দিলাম, এমন ত বন্ধু বান্ধবে করেই থাকে।

জননী। তবে তাই কর্‌বেন। কিন্তু সাবধান, যেন আমাদের নাম না জান্‌তে পারে।

নয়ন-তারা। ঘুণাক্ষরে আমরা দিয়েছি জান্‌তে পার্‌লে, তিনি নেবেন না।

উকীলবাবু। আপনারা সে বিষয়ে আমার উপরে নির্ভর কর্‌তে পারেন, জন মানব কেউ জান্‌বে না।

অতঃপর নয়ন-তারা নিজের টাকা হইতে উকীলবাবুর হস্তে দুই হাজার টাকা অর্পণ করিলেন। তিনি লইয়া গিয়া হরেন্দ্রকে ডাকাইলেন এবং "কোনও আত্মীয়ের নিকট হ'তে নিয়ে দিচ্চি" বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। হরেন্দ্র টাকাগুলি পাইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। ভাবিলেন সংকটহরণ প্রভু তাঁহার কোনও সংকট রাখিবেন না। তাঁহার প্রাণের একটা ভার কমিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি সৌজন্য-পূর্ণ পত্র লিখিয়া, রায় পরিবারকে তাঁহাদের চিরদিনের স্নেহ মমতা ও সাহায্যের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া সে টাকা সুরেশচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। সুরেশ টাকাগুলি ফেরত পাঠাইলেন। লিখিলেন, "আমার পিতা মহাশয় তাঁহার প্রাপ্য দেনার যে তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ঐ টাকার উল্লেখ নাই; এবং তাঁহার কাগজ পত্রেও কোনও স্থানে ইহার উল্লেখ দেখিতেছি না; অতএব অনুমান করি,

যদি তিনি ঐ টাকা আপনাকে দিয়া থাকেন, স্নেহের উপহার স্বরূপ দিয়াছেন, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না।" হরেন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন; অপর ট্রষ্টী তারাপদ রায় মহাশয়ের নিকট সেই টাকা প্রেরণ করিলেন। কনিষ্ঠ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরামর্শক্রমে লিখিলেন—"এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে গচ্ছিত থাকুক।" এই প্রস্তাব হরেন্দ্রের মনঃপূত হইল; তিনি উক্ত দুই হাজার টাকা তারাপদ রায় মহাশয়ের একজন বন্ধুর হস্তে গচ্ছিত রাখিলেন। তিনি ঋণ শোধ করিয়াছেন, এই চিন্তাতে তাঁহার মনের ক্লেশটা ঘুচিয়া গেল।

ইহার পরে নয়ন-তারার আর এক জ্বালা উপস্থিত হইল। ছেলেরা স্কুল হইতে আসে, আর এক এক দিন এক একটা কথা লইয়া আসে। কোনও দিন আসিয়া বলে—"বড় দি! হরেন দাদার কি হয়েছে? কেন আমাদের বাড়ীতে আসতে চান না? হাত ধরে কত টানাটানি করলাম কোনও মতেই এলেন না; তোমার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে?" কোনও দিন আসিয়া বলে—"হরেন দাদা আর সে হরেন দাদা নাই; রোগা হয়ে গিয়েছেন; কাল হয়ে গিয়েছেন; মুখে হাসি নেই; কেন এমন হয়েছেন?" কোনও দিন আসিয়া বলে,—"আসবার সময় হরেন দাদাদের বাসার একটী ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমার গলা শুনে হরেন দাদা বাইরে এলেন, চোক লাল, বোধ হয় কাঁদছিলেন।" এ সকল সংবাদ নয়ন-তারার পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "কোথায় পালাই! কোথায় যাই, যেখানে গেলে এ সকল সংবাদ রোজ রোজ কাণে আস্‌বে না।

অবশেষে বিধাতা পলাইবার একটা উপায় ঘটাইয়া দিলেন। তিনি আসিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার খুড়ীমার শরীরটা খারাপ হইতেছিল; এই সময় হইতে তাঁহার শরীরটা আরও অসুস্থ হইয়া পড়িল। নয়ন-তারা পিতৃব্যকে বলিয়া কহিয়া খুড়ীমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। স্থির হইল, যে তিনি খুড়ীমাকে লইয়া ও তাঁহাদের পরিবারের প্রাচীন কর্ম্মচারী নিধিরাম ঘোষকে অভিভাবক স্বরূপ করিয়া, মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিবেন; টুনী পটলা ও টেঁপী তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে; পিতৃব্য স্বয়ং গিয়া তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

তদনুসারে নিধিরাম ঘোষকে বাটী দেখিবার জন্য মুঙ্গেরে পাঠান স্থির হইল। নিধিরাম ঘোষের পরিচয়টা এখানে দেওয়া আবশ্যক। নিধিরাম বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর রায় মহাশয়ের সময়ের লোক। বয়সে রায় মহাশয়ের সমবয়স্ক হইবেন। বৃদ্ধ কর্ত্তার দেহান্ত হইলে রায় মহাশয় যখন দেশে আসিলেন, এবং বিষয় ভাগ হইল, তখন নিধিরাম রায় মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম দেখিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। মানুষটী স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সত্যবাদী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও অলোভী, এ প্রকৃতির পুরাতন হিন্দু আজ কাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ জন্য রায় মহাশয় নিধিরামকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন; ঘোষজা ঘোষজা বলিয়া ডাকিতেন; এবং তাঁহার সর্ব্ব প্রকার দায়ে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। বাড়ীর ছেলেরা ও ঘোষজা মশাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। পত্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুঙ্গেরে থাকিবার পরামর্শ হইলেই তারাপদ রায় মহাশয় ঘোষজাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"ঘোষজা মেজদা ত গিয়েছেন; তোমারও কাজ গিয়েছে; এ দিকে পেনসনেরও বয়স হয়েছে; এক কর্ম্ম করনা কেন, ছেলেরা ত কাজের লোক হয়েছে, আরত তোমার সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকবার দরকার নেই, তুমি মেয়েদের সঙ্গে মুঙ্গেরে গিয়ে থাক; ওদের ত একজন অভিভাবক চাই, তোমার মত অভিভাবক কে হতে পারে? সেখানে গিয়ে থাক, কাজ যা করতে হবে, তা ত তোমার পক্ষে সামান্য, গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে বাস কর্‌বে, নিত্য গঙ্গাস্নান করবে, আপনার ধর্ম্ম চিন্তা করবে ও এদের দেখবে। তোমার খাওয়া পরা ওদের সঙ্গেই চলে যাবে; আর তোমার বাড়ীতে মাসে ৩০৲ টাকা করে দেওয়া যাবে। কি বল?" ঘোষজা মশাই দুই এক দিন চিন্তা করিয়া নয়ন-তারার আগ্রহ ও অনুরোধে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও মুঙ্গেরে বাড়ী দেখিতে গেলেন।

মুঙ্গেরের কেল্লার মধ্যে কষ্ট হরণীর ঘাটের সন্নিকটে, গঙ্গার অব্যবহিত উপরে, বাগানের মধ্যে একখানি সুন্দর বাড়ী পাওয়া গেল। ঘোষজা মহাশয় বাড়ীখানি ভাড়া করিয়া, ইঁহাদের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নয়ন-তারা পিতৃব্যের সম্মতিক্রমে টুনী পটলাকে ও টেঁপীকে সঙ্গে লইবার জন্য চুঁচড়া হইতে আনাইলেন। সে বাড়ীর দশা যেরূপ দাঁড়াইতেছে,

তাহাতে টুনী পটলাকে সেখানে একদিনও রাখা উচিত বোধ হইল না। সুরেশ আপত্তি করিতে পারিলেন না; কিন্তু হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন কে তাঁহার পাঁজরা হইতে দুইখানা হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। ভাই বোনগুলিকে তিনি এমনি ভালবাসেন। জননী ও ইহাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। নয়ন-তারা চলিয়া যাওয়ার পর এই ছেলে মেয়েই তাঁর অবলম্বন ছিল; তাহাদিগকে ছাড়িতে তাঁর হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। তাই তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য নয়ন-তারা তাঁহাকেও কলিকাতায় আনাইলেন ও অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

নয়ন-তারা। মা, তোমাকে একলা ফেলে সকলে চলে যাচ্চি, আমার বুক্ ফেটে যাচ্চে, কিন্তু কি করবে বল, দেখছ ত বাড়ীর দশা কি দাঁড়াচ্চে, তুমি কি সে বাড়ীতে ওদের দুজনকে রাখ্‌তে বল ?

জননী। না, তাহলে ওরা বয়ে যাবে। ওরা তোর কাছে থাক্‌বে সেই ভাল। তবে কিনা আমি এক্‌লা থাকি কি করে, চল আমিও তোদের সঙ্গে যাই।

নয়ন-তারা। তুমি সে বাড়ী ছাড়লেই দাদা সেই দণ্ডে বাড়ী ছেড়ে যাবেন, তোমাকে চোক কাণ বুজে কিছুদিন থাক্‌তে হবে। আমরা দু চার মাস দূরে থাক্‌লেই দাদা থাক্‌তে পার্‌বেন না, হরেনবাবুর কাছে মাপ চাবেন ও আমাদের ঘরে আন্‌বেন।

জননী। তোমরা যে একগুঁয়ের ঝাড়, তার কি এমন সুমতি হবে ?

নয়ন-তারা। না হয় ভাবনা কি, খুড়ীমা চলে এলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখ্‌বো। ভালই ত, তোমার দুটো বাড়ী হলো; মন খারাপ হলেই আমাদের কাছে যাবে। এক রাত্রের পথ বৈত নয়।

তৎপরে যথাসময়ে মুঙ্গের যাত্রার দল মুঙ্গেরে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বলা বাহুল্য এই দলে টাইগারও আছে। তাহাকে ছাড়িয়া টুনী পটলা কি যাইতে পারে !

মুঙ্গেরে গিয়া নয়ন-তারা দুই দিনের মধ্যে বাড়ীখানি সাজাইয়া, সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া, খুড়ীমার শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীখানি অতি সুন্দর, চারিদিকে উদ্যান, বারাণ্ডাটীতে বসিলেই সুরধুনীর সুমন্দ প্রবাহিত জলরাশির

উপরে দৃষ্টি পড়ে ; উদ্যানটীর এক কোণে কয়েকটী ঘর আছে, তাহারই একটী ঘরে ঘোষজা মশাই আশ্রয় লইলেন এবং মনের সাধে নিত্য গঙ্গাস্নান ও সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবাতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মালোচনাতে দিনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। খুড়ীমা দুই মাস থাকিয়া চলিয়া আসিলেন ; তখন নয়ন-তারা স্বীয় জননীকেও সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মপ্রচারক মহাশয়দিগের তিনটী কন্যাকে লইয়া গেলেন। জননীকে দুই মাস রাখিয়া শরীর মন সুস্থ করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

এইবার তিনি মনের মত করিয়া মুঙ্গেরের গৃহস্থালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর-চিন্তা ও উপাসনাদির জন্য একটী পূজার ঘর রাখিলেন। সেটী তাঁহার নির্জ্জনবাসের জন্য রহিল। বাড়ীটীর সমুদয় আসবাব জিনিসপত্র, বাগান বাহিরের ঘর সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝরে ; কোনও স্থানে একটু মলিন দ্রব্য দেখা যাবে না, এখানেও তাঁহার সংসারটী ক্ষুদ্র নয়। নিজে যেরূপ ক্লেশেই থাকুন না কেন টুনী পটলাকে পিতা যেরূপ অবস্থাতে রাখিতেন, যতদূর সম্ভব সেই অবস্থাতে রাখা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া তাহাদিগের অর্থ তাহাদের রক্ষা ও শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহাদের বায়ু সেবনের জন্য একখানা গাড়ি ও একটা ঘোড়া কিনিলেন ; পটলার চড়িবার জন্য একটা ঘোড়া কিনিলেন ; বাড়ীর একটী ঘরে বালিকাদের জন্য একটী স্কুল করিলেন, নিজ ব্যয়ে তাহাতে দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন ; তাহাতে বাহিরের কতকগুলি বালিকা আসিতে লাগিল, তাহাদিগকে আনিবার জন্য নিজ ব্যয়ে একখানি বএলী গাড়ি ও দুইটী বলদ কিনিলেন ; এতদ্ভিন্ন টুনী পটলাকে পড়াইবার জন্য তাহাদের টাকা হইতে স্বতন্ত্র মাষ্টার রাখিলেন। টাকা কড়ির হিসাব রাখা, আয় ব্যয় দেখা, জিনিস পত্র কেনা, ও চাকর, রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে চালাইবার ভার ঘোষজা মহাশয়ের প্রতি রহিল। ঘোষজা মহাশয় আনন্দের সহিত সে ভার বহন করিতে লাগিলেন।

ঘোষজা মশাই ত অভিভাবক আবার ঘটনাক্রমে আর একজন অভিভাবক আসিয়া যুটিলেন। উদাসী বাবা নামে একজন রামনুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সাধু এই সময়ে কষ্টহরণীর ঘাটে বাস করিতেছিলেন। ঘোষজা মশাই সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদের সংবাদ নয়ন-তারাকে দেন ও উভয়ে পরামর্শ

করিয়া তাঁহাদের জন্য সিধা পাঠান হয়। ঘোষজা আসিয়া বলিলেন, এই উদাসী বাবা অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারেন ও একজন প্রকৃত ভক্ত মানুষ। প্রতিদিন তাঁহার ও তাঁহার দুই শিষ্যের জন্য সিধা যাইতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদ উদাসী বাবার কর্ণগোচর হইল। তিনি একদিন ঘোষজার অনুরোধক্রমে নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নয়ন-তারা দেখিলেন মানুষটী বর্ষীয়ান এবং তাঁহার ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য। প্রথম দর্শনের দিনে বাবাজী এমন প্রীত হইয়া গেলেন, যে আর একদিন আসিলেন। ক্রমে নয়ন-তারা অনুনয় বিনয় করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য বাবাজীকে ধরিলেন। বাবাজী সপ্তাহে দুই তিন দিন অপরাহ্ণে আসিয়া উদ্যান মধ্যস্থিত প্রস্তর আসনে বসেন এবং নয়ন-তারা নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লন। এইরূপ কিছুদিন চলিল। অবশেষে নয়ন-তারার কর্ণগোচর হইল যে, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ঘাটে যে ঘরে থাকেন, সেখানে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন না; সর্ব্বদাই অপর সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া বিরক্ত করে; তিনি একটু একান্তে চিন্তা ও ভজন সাধন করিতে পারেন না। তখন উদাসী বাবার জন্য তাঁহার উদ্যান সংলগ্ন গঙ্গাতীরবর্ত্তী দুটী ঘর ভাড়া করিয়া গুরুজীকে তাহাতে আসিয়া থাকিবার জন্য আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিলেন। বাবাজী তাহাতেই সম্মত হইলেন। নয়ন-তারা উক্ত ভবনের প্রাঙ্গণের কিয়দংশ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, সেই দুইটী ঘর মেরামত করিয়া ও লোকের বসিবার সুন্দর স্থান করিয়া দিয়া বাবাজী ও শিষ্য-দ্বয়কে তথায় স্থাপন করিলেন। এই নিয়ম করিয়া দিলেন, দিবসে ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বাহিরের লোক আসিতে পারিবে না। এই সময় বাবাজী আহার, বিশ্রাম, চিন্তা, পাঠ, এই সমুদয় কার্য্যে যাপন করিবেন।

বাবাজী এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটা মহা লাভ হইল; তিনি যখন ৩টার সময় শিষ্যদ্বয়কে পাণিনি, ভারবি ও শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়ান, তখন নয়ন-তারা গিয়া পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁহার সংস্কৃত পড়াটা উত্তমরূপে চলিল।

নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বাদে যে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা নয়ন-তারা বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানের সাহায্যে ব্যয় করেন। বালিকাদের স্কুলটীর ব্যয়, চারিটী বালিকার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়, গুরুজী ও শিষ্যদ্বয়ের ভরণপোষণের ব্যয়,

এসকল বাঁধা ব্যয়ত আছেই; ইহার উপরে হাতে কিছু টাকা জমিলেই কোন না কোন সৎকার্য্যে দিয়া থাকেন। একবার মুঙ্গের বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের জন্য ২০৲ বিশ টাকা দিলেন, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ২০৲ বিশ টাকা দিলেন, পবলিক লাইব্রেরির জন্য ১০৲ দশ টাকা দিলেন, সুরাপান নিবারণী সভাতে ২০৲ বিশ টাকা দিলেন। ভাল কাজের জন্য ধরিলে না বলা নাই, কিছু দিতেই হইবে; যেন দুই হস্তে অর্থ বৃষ্টি করিতে থাকেন! এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসেই নিজের লাইব্রেরীর জন্য নূতত নূতন বৈ ক্রয় করেন।

মুঙ্গেরে যে নিয়মে তাঁহার দিন যাইতে লাগিল, তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক। প্রাতে উঠিয়া প্রথম কর্ম্ম, ছেলেদিগকে পূজার ঘরে সম্মিলিত করিয়া ভগবানের গুণানুবাদ পূর্ব্বক দিন আরম্ভ করেন; তৎপরে তাহাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থাতে নিযুক্ত হন; প্রাতরাশান্তে তাহাদিগকে পড়াইতে বসেন; ছেলেরা পড়িয়া উঠিয়া স্নানাহার করে, তখন তাহাতে মনোনিবেশ করিতে হয়; আহারান্তে ছেলেরা স্কুলে যায়, তখন তিনি একটু অবসর পান, এবং স্নানান্তে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বর-চিন্তা ও পূজাতে নিয়োগ করেন; তৎপরে একাকিনী চারিটী নিরামিষ আহার করেন; আহারান্তে যখন বিশ্রামের সময় হয়, তখনও একটা না একটা বিষয় পাঠ করিয়া আপনাকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করেন। এই সময়টাতে কখন কখনও হৃদয় শূন্যতা ও বিষাদে ডুবিতে চায়। সেজন্য এক একদিন মনটা অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে সময়ের জন্যেও একটী সঙ্গী যুটিয়া থাকে। তিনি খাটটীতে শুইয়া আছেন দেখিলেই, টাইগার আসিয়া খাটের গায়ে দুটী পা দিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার গা শুঁকিয়া ও গাল চাটিয়া আদর করিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন তিনি টাইগারের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলেন, "টাইগার! তুই কি আমার lover—প্রণয়ী?"

দুপর বেলাটা তিনি পড়াশুনাতে যাপন করেন; ৩টার সময় উদাসী বাবার নিকটে গিয়া সংস্কৃত পড়েন; বৈকালে ছেলেরা আসিলে আবার তাদের খাওয়া দাওয়া দেখিতে হয়; সন্ধ্যা কালের আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয়; অপরাহ্নে ছেলেরা বাগানে খেলা করে, তখন তিনি ছেলেদের খেলা দেখেন; সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে লইয়া আহার করেন; আহারের সময় সেদিন কে কেমন পড়া দিয়াছে, কে কি নূতন শিখিয়াছে, এই সকল কথা হয় ও গল্প হয়;

আহারান্তে বিশ্রামের সময় নানাবিধ গল্প চলিতে থাকে; তৎপরে সকলে মিলিয়া একটু ভগবানের নাম গান করা হয়; তদনন্তর মেয়েদিগকে বেহালা ও শেতার বাজাইতে শিখান; বাজনা শেখা হইলে, অল্পবয়স্ক শিশুরা ঘুমাইতে যায়, বড়রা পড়িতে বসে, তখন তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও আত্ম-চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন।

এখানে তাঁহার আর দুইটী কাজ আছে;—তাহা বাগানের বৃক্ষগুলির পরিচর্য্যা ও পটলার প্রাণি-বাটিকার তত্ত্বাবধান। মানবের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রকৃতির সহবাসে তিনি অধিক অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছেন। এক একদিন বৈকালে ছেলেরা যখন খেলা করে, তখন তিনি সুমন্দবাহিনী সুরধুনীর প্রবাহোপরি এবং অস্তগমনোন্মুখ-রবিকিরণ-রঞ্জিত তরুরাজির উপরি চক্ষু ফেলিয়া দীর্ঘ বেলা বসিয়া থাকেন; হৃদয় মন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া প্রকৃতির অধীশ্বরের চরণে উপনীত হয়! কোন কোনও দিন সন্ধ্যার পর ছেলেরা শয়ন করিলে তিনি উদ্যান মধ্যে গিয়া একাকিনী বৃক্ষতলে আসন পরিগ্রহ করেন; তখন দাসদাসীর প্রতি ডাকিতে নিষেধ থাকে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায়, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন; কখন যে উঠিয়া শয়ন করিতে আসেন কেহ জানিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে রবিবার প্রাতে ছেলেদিগকে লইয়া পাহাড়ের তলে, বনের মধ্যে, গমন করেন; তাহারা সেখানে বনভোজন করে ও খেলা করে; তিনি একাকিনী অরণ্য মধ্যে আসন পাতিয়া আত্ম-চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। এইরূপে মুঙ্গের বাসকালে আত্ম-চিন্তা, পাঠ, জ্ঞানালোচনা ও সদনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই নির্জ্জন স্থানে তিনি সম্পূর্ণরূপে বন্ধুবিহীন নহে। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য্য, সুরাপান নিবারিণী সভার সম্পাদক প্রভৃতি দুই চারিজন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত অনেক ভাল বিষয়ে কথা হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী নির্জ্জনের বন্ধু আছে, সেটী তাঁর লাইব্রেরি। এটী তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত সম্পত্তি। লাইব্রেরিটী এমনি ভালবাসেন, যে সেখানেই অবসর কালের অধিকাংশ যাপন করেন, পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও যেন সুখ হয়, বলিয়া

বসিয়া ভাবেন, "ইহাদের মত বন্ধু কে? সর্ব্বদাই ভাল কথা বলে, ভাল কথা ভিন্ন মন্দ কথা জানে না।' এইরূপে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

আর দুইটী ঘটনা বর্ণন করিলেই নয়ন-তারার বিবরণ শেষ হয়। প্রথম ঘটনাটী এই, উদাসী বাবার যে দুইটী শিষ্য সঙ্গে আছে, তাহার মধ্যে ছোটটীর নাম গিরিধারী, তাহার বয়স ২৬।২৭। নয়ন-তারা ৩টার সময় যখন পড়িতে যান, তখন দেখিতে পান যে গিরিধারী তাঁহার দিকে অধিক মনোযোগ দেয়, তিনি যখন অন্যমনস্ক ভাবে থাকেন, তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, চক্ষে চক্ষে মিলন হইলে মুখ নত করিয়া যেন পাঠে মনোনিবেশ করে, তিনি যখন চলিয়া আসেন, তখন তিনি অদর্শন হওয়া পর্য্যন্ত দেখিতে থাকে। এটা তাঁহার ভাল লাগে না। একবার মনে করিলেন এ বিষয়টা গুরুজীর গোচর করিবেন; আবার ভাবিলেন, অনভ্যাস বশতঃই এরূপ ক্ষণিক উত্তেজনা হইয়া থাকে, কালে তিরোহিত হইবে। হঠাৎ গুরুজীর গোচর করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপে কিছুদিন চলিতে লাগিল। একদিন তিনি গভীর রাত্রে বৃক্ষতলে একাকিনী চিন্তাতে নিমগ্ন আছেন। কত ঘণ্টা অতীত হইয়া যাইতেছে তাহা মনেই নাই, এই ভাবে বসিয়া আছেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখেন, কে যেন সম্মুখস্থ প্রস্তর-নির্ম্মিত আসনে বসিয়া আছে; অন্ধকারে মানুষ চেনা যাইতেছে না, কিন্তু পুরুষের মূর্ত্তি বুঝিতে পারা যাইতেছে। দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; কে এখানে এমন সময়ে বসিয়া আছে? কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের ভয় মনে নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেও।"

গিরিধারী। (হিন্দীতে) আমি গিরিধারী।

নয়ন-তারা। (হিন্দীতে বিরক্তিসূচক স্বরে) তুমি কেন এমন সময়ে এখানে।

গিরিধারী প্রথমে যে ভাবে আসিয়াছিল, সে ভাব থাকিলে হাসিয়া কথা কহিত ও "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিত; কিন্তু নয়ন-তারাকে ধ্যানমগ্না দেখিয়া বেচারা প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, অপেক্ষা করিতে করিতে পুরাতন ভাবটা অন্তর্হিত হইয়া একপ্রকার ভয়-মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং নয়ন-তারার বিরক্তি দেখিয়া, সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল; মুখে কথা বাঁধিয়া যাইতে লাগিল।

গিরিধারী। আমি—আমি—আপনার—আপনার সঙ্গে কিছু কথা—

নয়ন-তারা। (বিরক্তি সূচক স্বরে) আমি তোমার কথা শুনতে চাই না; তুমি এই দণ্ডে এখান থেকে যাও; যা বলবার আছে, কাল দিনের বেলা বলবে।

গিরিধারী। আমি যাচ্ছি আপনি দয়া করে এ কথা——

নয়ন-তারা। (ক্রুদ্ধভাবে) কি আশ্চর্য্য! তুমি আমার কথা শুনছনা কেন? তুমি আর এক মুহূর্ত্ত যদি এখানে থাক, আমি চাকরদের ডেকে তোমাকে বাগান হতে বার করে দেব।

গিরিধারী। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, গুরুজীকে এ কথা——

নয়ন-তারা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) ফের তুমি কথা কও; তবে আমি চাকরদের ডাকি।

গিরিধারী। না না, আমি চল্লাম———প্রস্থান।

পরদিন প্রাতে নয়ন-তারা রাত্রের ঘটনা গুরুজীর গোচর করিলেন। বাবাজী ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইয়া গেলেন; গিরিধারীকে সেই দণ্ডে তাড়াইয়া দিতে চাহিলেন; কেবল নয়ন-তারার অনুরোধে তাড়াইলেন না। কিন্তু তাহার প্রতি এই শাস্তি বিধান করিলেন, যে এক পক্ষ কাল সে বাড়ীর বাহির হইবে না, পাঠ গ্রহণ করিতে পাইবে না, গুরুজীর সেবা করিতে পাইবে না, ও সমাধ্যায়ী অপর শিষ্যের সহিত আলাপ করিতে পারিবে না। এই শাস্তি পাইয়া সে ব্যক্তি নীরব কারাগারে এক পক্ষ কাল বাস করিল। তৎপরে তাহার প্রতি বাহির হইবার ও পড়িতে আসিবার আদেশ হইল। এই সময় হইতে গিরিধারী জন্মের মত স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে শিখিল; এবং ইহার পর আর ভয়ে নয়ন-তারার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিত না।

দ্বিতীয় ঘটনা, একবার নন্দরাণী লিখিলেন—"ভাই! কবে আসবে বল, তোমায় ছেড়ে আর চলে না; আমরা থাকতে পারি না। তোমার দাদার দশা যদি দেখতে দুঃখ হতো। দিন দিন ঠাকুরপোর অনেক কীর্ত্তি শোনা যাচ্ছে, তাইতে উনি মনের ক্লেশে আছেন; নিজে একেবারে মদ ছেড়ে দিয়েছেন, বলেছেন বাড়ীতে আর মদ আনতে দেবেন না; আর মুখে হাসি নেই; এমন যে সদানন্দ মানুষ, যেন একেবারে নিবে গিয়েছে; ছেলেগুলো

কাছে গেলে চেয়ে দেখেন না ; কেবল পড়ে পড়ে ভাবেন ! এ সব তোমারি জন্যে। ঠাকরুণের ত কথাই নাই, তাঁর শরীর মন দিন দিন ভেঙ্গে যাচ্চে। আর কেন ভাই ! ঘরে ফিরে এস।"

প্রত্যুত্তরে নয়ন-তারা লিখিলেন :—"জান ত ভাই ! কেন ফিরে যেতে পার্‌ছি না ; ফিরে যাবার অন্য কারণ না থাকলেও এক কারণে ফিরে যেতাম। তুমি যে লিখেছ দাদা একেবারে মদ ছেড়েছেন, ও বাড়ীতে মদ আসতে দেবেন না বলেছেন, এতে যে কি আনন্দ হয়েছে, তোমাকে লিখে জানাতে পারি না। কাছে থাকলে দাদাকে কত কিস দিতাম ! এখান থেকে অনেক কিস দিচ্চি। আমার দাদা এতদিনের পর আমার মনের মত হয়েছেন, এখনি ত আমার দাদার কাছে থাকবার কথা ; কিন্তু ভাই ! যে প্রতিজ্ঞা করে বাহির হয়েছি তা কিরূপে লঙ্ঘন করি ? দাদা যদি হরেন বাবুর বাড়ী গিয়ে হাতে ধরে মাপ চান, দুজনে যদি ভাব হয়, হরেন বাবু যদি আমাদের বাড়ীতে আসেন, এসে আমাকে পত্র লেখেন যে তাঁর মনের সকল ভার চলে গিয়েছে, তা হলে আমি যেতে পারি।' অথবা এ সকল কথা লিখে আর ফল কি ? আমি জানি দাদা তা পারবেন না, এবং হরেন বাবুকেও আর টানাটানি করা ভাল বোধ হয় না। সে সব ত ঘুচেই গিয়েছে ! তিনি এখন আমাদের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে সমুদয় মন দিয়ে নিজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হয়েছেন ; সেই ভাল ; আবার অসার প্রেমে আবদ্ধ করা কেন ?"

নন্দরাণী এই পত্র যখন সুরেশকে পড়িয়া শুনাইলেন তখন তাঁর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। ভগিনীর চুম্বন পাইয়া ভালবাসাটা উথলিয়া উঠিল ; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

নন্দরাণী। হরেন বাবুর সঙ্গে দেখা করনা কেন ?

সুরেশ। (গম্ভীরভাবে) তা কি করে পারি ?

সুতরাং নয়ন-তারার ঘরে ফিরিবার আশাটা বিলীন হইয়া গেল। তিনি মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরের বাড়ীতেই রহিলেন।

এই অবস্থায় যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া আসে, তাহারা সকলেই বলে তিনি কঠোর তপস্যাতে আছেন। সন্ন্যাসিনীর ন্যায় নিরামিষ চারিটী অন্ন আহার করেন ; একখানা খাটে এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকেন ; অশন বসনের

দিকে একেবারে দৃষ্টি নাই; তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত ফিরিয়া গিয়াছে; মুখে গাম্ভীর্য্য ও প্রসন্নতা মিশ্রিত এক প্রকার মধুর কান্তি ফুটিয়াছে; যাহা দেখিলে মন শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। সহরের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম যে একবার তাঁহাকে দেখে, সেই শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না।

সমাপ্ত।